www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

সীমানা ছাড়িয়ে

অমরনাথ দর্শন

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১ জ্যৈষ্ঠ – ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ ঃ ১৬ মে – ২২ মে, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 29, 16 May - 22 May, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

এবার কোথায়? যখন তখন যে কোনও সময়

নিজস্ব প্রতিনিধি : খাগড়াগড়–পিংলা–কেতুগ্রাম। বর্ধমান–পশ্চিম মেদিনীপুর–বর্ধমান। এবার কোথায়? উত্তরে গোয়েন্দারা জানালেন, এতো শুধু হিমশৈলের চূড়া মাত্র। সারা রাজ্যটাই বারুদের স্তূপে দিন গুনছে। যে কোনও সময়ে রাজ্যের যে কোনও জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। দীর্ঘ বাম সরকার ও চার বছরের তৃণমূল সরকারের অকর্মণ্য পুলিশের বদান্যতায় ও কারসাজিতে সারা রাজ্য জুড়ে বাজি তৈরির আড়ালে চলছে বোমা তৈরির কারখানা। যা ছড়িয়ে পড়ছে অন্যান্য প্রতিবেশি রাজ্যেও। গোয়েন্দাদের কথায় পশ্চিমবঙ্গ হল বোমা কারিগরদের সেফ জোন।' এখানে পাচার করার সুবিধাও প্রচুর। বিশেষ করে পুলিশ এখানে চাঁদির জুতোয় কাত।

গোয়েন্দা সূত্রের খবর এ রাজ্যে রমরমার আর একটা প্রধান কারণ হল চাহিদা। রাজনৈতিক দলের কল্যাণে বোমার চাহিদা এখানে প্রচুর। বিশেষ করে নির্বাচনের বাজারে বোমার অর্ডার অগাধ। তার ওপর নির্বাচনের মরশুম চলেছে। বাংলার পঞ্চায়েত, লোকসভা, পুরসভা, সামনে আসছে বিধানসভার মহারণ। অর্থাৎ বোমা এখন বাংলার কুটির শিল্পের রূপ নিতে চলেছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর ছোটখাটো বোমা তৈরির সূত্র ধরেই সংযোগ ঘটছে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে। সামান্য বোমার কারবারিরা ধীরে ধীরে পা রাখছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের আঙিনায়। জন্ম নিচ্ছে বৃহৎ ষড়যন্ত্র। এ রাজ্যে আরও একটা সুবিধা বোমা কারবারিদের উৎসাহিত করে। এখানে রাজনীতিকরা এসব ঘটনাকে তেমন পাত্তা দিতে চান না, বরং ধামা চাপা দিতে চেষ্টা করেন। ফলে তেমন উৎপাত পোয়াতে হয় না বাজি বা বোমা ব্যবসায়ীদের।

মাঝে মধ্যে বাধ সাধে অসাবধানতা। কারিগরদের অতি উৎসাহে বা গাফিলতিতে ঘটে বিস্ফোরণ। শুরু হয় তদন্ত। অনেক তথ্য, অনেক সূত্র, অনেক সময়। ধীরে ধীরে থিতিয়ে যায় সবকিছু। গোয়েন্দারা বলছেন, যত তৎপরতা ঘটনা ঘটার পর। আগেভাগে তল্লাশি করে বেআইনি বাজি কারখানাগুলো বন্ধ করার কোন প্রয়াস নেই পুলিশের তরফ থেকে। এলাকায় অবাধে বোমা তৈরি হলেও খোঁজ রাখে না পুলিশ। তাই এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে। কোথায়, কখন। তা শুধু ভগবানই জানেন!

ভূকম্পে ক্ষতি নামখানাতেও

নিজস্ব প্রতিনিধি : পর পর ভূমিকম্পে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানা ব্লকের দক্ষিণ চন্দ্রনগর বিদ্যাসাগর শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ৮ জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। আতঙ্ক রয়েছে পড়ুয়া থেকে অভিভাবকদের মধ্যে। এছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভেঙে গিয়েছে ৭০টি ঘর।

আইলা বাঁধ দেখতে গিয়ে পাথর প্রতিমার জমিদাতাদের ক্ষোভের মুখে দুই মন্ত্রী

মেহেবুব গাজি

আগামী বর্ষার আগে সুন্দরবনের আইলা বিধ্বস্ত পঞ্চাশ কিমি নদী ও সমুদ্র বাঁধ তৈরির কাজ শেষ হবে। বুধবার সুন্দরবনে আইলা বাঁধের কাজ পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন ও সেচ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা। এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ কাকদ্বীপের লট নম্বর আট থেকে লঞ্চে চেপে দুই মন্ত্রী সহ বিধায়করা আইলা বাঁধের কাজ দেখতে প্রথম যান সাগরের কচুবেড়িয়া।

সেখান থেকে একে একে যান মুড়িগঙ্গা, মৃত্যুঞ্জয়নগর, সুমতিনগর, নন্দাভাঙা। সাগরের পরে নামকানা ব্লকের দেবনগরে বাঁধের কাজ পরিদর্শন করেন তাঁরা। সবশেষে পাথরপ্রতিমার দক্ষিণ লক্ষ্মীনারায়ণপুর, দক্ষিণ সুরেন্দ্রগঞ্জ ও কালীনগরে বাঁধ দেখতে যান। এই আটটি পয়েন্টের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়নগরে লঞ্চ থেকে নেমে বাঁধ দেখতে যান দুই মন্ত্রী। দুই মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে এখানকার বাসিন্দারা জমি অধিগ্রহণের পর ক্ষতিপূরণের টাকা না মেলায় ক্ষোভ উগরে দেন। বাসিন্দারা সরাসরি মন্ত্রীদের জানিয়ে দেন, বাঁধের জন্য জমি দিতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জমি অধিগ্রহণের পর ক্ষতিপূরণের জন্য টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু সেই ক্ষতিপূরণের টাকা আজও পেলাম না।

জমিদাতা গ্রামবাসীদের কথা শুনে রাজীব বলেন, ''সরকার নির্দিষ্ট আইনমাফিক জমি অধিগ্রহণ করলে ক্ষতিপূরণ দেবে। ক্ষতিপূরণ থেকে কেউ বঞ্চিত হবেন না।' একই ছবি ধরা পড়ে পাথরপ্রতিমার দক্ষিণ লক্ষ্মীনারায়ণপুরেও। এখানেও প্রায় জনা পঞ্চাশ জমিদাতা গ্রামবাসী ক্ষতিপূরণের টাকা না পেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে রাজীব বলেন, ''আগের বাম সরকার মাত্র ২৭ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল। ৬ দফা প্যাকেজও ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এক কিমি বাঁধ তৈরি করেনি।

আমাদের সরকার মাত্র ২৭ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল। ৬ দফা প্যাকেজও ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এক কিমি বাঁধ তৈরি করেনি। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর কৃষকদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করে। তবে আমরা বিদেশের প্রযুক্তি নিয়ে নদী থেকে পলি তুলে বাঁধ নির্মাণের কথা ভাবছি। সেক্ষেত্রে বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করতে হবে না। কারণ এই মানুষদের জন্যই তো বাঁধ নির্মাণ। এখনও পর্যন্ত ২২৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। আরও কিছুদিনের মধ্যে প্রায় ৫০ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পূর্ণ হবে। কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছে। সমস্যা দ্রুত কাটানোর সরকারি প্রক্রিয়া চলছে।

জমি অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ না হওয়ায় সব বাঁধের কাজ শুরু করা যায়নি। এই খাতে ৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে সেই কাজ শেষ করতে হবে। ৫০ কিমি আইলা বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে। সেই কাজ দ্রুত শেষ হবে।' সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, 'গোসাবা ও উত্তর ২৪ পরগনায় জমি নিয়ে কিছু সমস্যা থাকায় বাঁধের কাজ শুরু করা যায়নি। স্থানীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জমিদাতাদের সঙ্গে কথা বলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দ্রুত সব জমিদাতা ক্ষতিপূরণ পাবেন।'

তবে সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি জমি অধিগ্রহণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দেগে বলেন, '২০১০ সালে ইউ পি এ সরকারের আমলে আইলা বাঁধ নির্মাণের জন্য কেন্দ্র ৫০৩২ কোটি টাকা দিয়েছিল। তিন বছরের মধ্যে বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু পাঁচ বছর পরও কাজ বিশেষ হয়নি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে বর্তমান সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে খরচ না হওয়া টাকা ফেরৎ দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবনের কৃষকদের চার গুণ বেশি দামে জমি, সঙ্গে জমিদাতা পরিবার পিছু একজনের সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখন সরকার কেন তা পালন করছে না?'

অবাধে চলছে জমি জবর দখল, নীরব রেল কর্তারা

ঈপ্সিতা সরকার

আইন পাশ হয়েছে প্রায় দেড় শতক আগেই, সেই ব্রিটিশ আমলে। সালটা ১৮৯৪। স্বাধীনতার পরে সংশোধন হয়েছে বহুবার, তৈরি হয়েছে নতুন বিল তবে বাস্তবে তা কতটা সার্থকভাবে বলবৎ হয়েছে, প্রশ্নটা সেখানেই। কথা হচ্ছে রেলের জমি বেআইনিভাবে অধিগ্রহণ বিষয়ে। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে বিভাগের অধীনস্ত জমি জবরদখল প্রতিরোধে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডিআরএম (ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার), ডিইএন (ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার)–রা কি ১৯৯৩ সালে পাশ হওয়া পিপিই (পাবলিক প্রেমিসেস এভিকশন) অ্যাক্ট অনুযায়ী তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছেন? এবিষয়ে দঃ পূঃ রেলওয়ে শাখার মণ্ডল আধিকারিক (খড়্গপুর) এর থেকে মিলল না সদুত্তর।

১৯৯৩ সালে পাশ হওয়া আইনে বলা হয়েছে জমি অধিগ্রহণ বিষয়টির দায়িত্বে থাকবে মণ্ডলের ইঞ্জিনিয়র (ডি.ই.এন)। আইনটির অষ্টম পরিচ্ছদে অধিগ্রহণের

নিয়মাবলী, নবম পরিচ্ছদে পদ্ধতি এবং দশম পরিচ্ছদে 'কাস্টডি' সংক্রান্ত বিষয়ে যে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে সেই অনুযায়ী অধিগ্রহণের পক্ষে আদর্শ, দুর্বল এলাকাগুলির চিহ্নিতকরণ, ঘনবসতিপূর্ণ শহরাঞ্চলে রেলের জমি 'পাকা' বাউন্ডারি দ্বারা সংরক্ষণ ও স্বল্পজনবসতিপূর্ণ গ্রামাঞ্চলে ও জনপদগুলিতে কাঁটাগুল্ম রোপনের মাধ্যমে এলাকা সংরক্ষণ, নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষণ, অধিকর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে নতুন অধিগ্রহণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা, এলাকাগুলিতে বাৎসরিক পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় তথ্য নথিভুক্ত করে তা রেলমন্ত্রকের কাছে পাঠানোর বিষয়ে ডিইএন দায়বদ্ধ থাকবে। বেআইনিভাবে অধিগৃহীত জমির এলাকা, যথার্থ বিবরণ সহ (কাঁচা না পাকা), পরিদর্শনের তারিখ, উচ্ছেদের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ১৯৮৯ সালের রেলওয়ে আইনের ১৪৭ নং ধারা অনুযায়ী নতুন অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৫ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পুরনো অধিগৃহীত জমি পুনরুদ্ধারের বিষয়ে ১৯৭১ সালে পাশ হওয়া পিপিই অ্যাক্ট বলবৎযোগ্য।

এরপর পাঁচের পাতায়

রেলের আরও কীর্তি ভিতরে

জীবন দিয়ে ফরজানা প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেলেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দলের মৃত্যু কি ক্রমশ এগিয়ে আসছে?

ওঁকার মিত্র

কলকাতা ও রাজ্যের পুরসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেস সচেতনভাবেই সাফল্যকে বড় করে দেখাতে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা চাইছে এই সাফল্যের রেশ আগামী বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে। কারণ তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ জানে সাফল্যের আলোয় ফলাফল যতটা চকচক করছে তা থেকে অনেক বেশি অন্ধকার ফলাফল বিশ্লেষণে। ফরজানার নিগ্রহ ও মৃত্যু এই সত্যটাকে জনগণের সামনে খুলে দিয়ে গেল। একসময় তৃণমূল নেত্রীর কাছের মানুষ কলকাতার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র ফরজানা জীবন দিয়ে বলে দিয়ে গেলেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দলের পতন আসন্ন প্রায়।

এর ইঙ্গিত আমরা আগেও পেয়েছি। আসানসোল, হাওড়ার পাশাপাশি রাজ্যের সর্বত্র প্রতিদিন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দুর্বল হচ্ছে তৃণমূল, যাকে সাফল্যের আড়ালে লুকিয়ে রাখছেন নেতা–নেত্রীরা। ফলে এর প্রকোপ সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। পুরসভা নির্বাচনে অবশ্য কলকাতায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে লুকিয়ে রাখা গেল না। মনোনয়নের সময় তৃণমূলের গোঁজ প্রার্থীর অভাব ছিল না। পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে প্রার্থী করে সামাল দিতে হয়েছে অনেকটা। নির্বাচনের পর আক্রমণের মুখে পড়লেন শোভনদেব থেকে ফরজানা অনেকেই। ফলাফল বেরোনোর পর হেরে যাওয়া তৃণমূল প্রার্থীরা প্রকাশ্যে দলের একাংশকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু দলের কোনও নেতানেত্রীর মুখে এ ব্যাপারে কোনও প্রতিবাদ নেই। এমনকি দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জনগণের সামনে এর পাল্টা বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন নি। আসলে সাফল্য যখন সঙ্গে থাকে তখন দলের দুর্বলতা নিয়ে বিশ্লেষণ করার মতো সাহস ও দৃঢ়তা কটা দলের থাকে? রাজ্যের কংগ্রেস, সিপিএম কারোরই ছিল না, তৃণমূলেরও নেই। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে, বেনোজলে যেমন অন্যদের পতন হয়েছে তেমনই ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে তৃণমূলের জন্যও। এসব আলোচনা অবশ্যই হবে তবে সেটা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর। আসানসোল, হাওড়া, শিলিগুড়ি, শোভনদেব, ফরজানা তখন বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে উঠবে। অতএব এসবের উত্তর জানতে গেলে আমাদের পতন অবধি অপেক্ষা করতেই হবে।

এখন প্রশ্ন এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, খেয়োখেয়ি কেন? উত্তর খুব সোজা। দলের অধিকাংশ কর্মীরাই দলে কিছু পেতে এসেছে। মমতা দিদির মত মার খেয়ে অভুক্ত থেকে বাংলা মায়ের ভালো করতে নিশ্চয়ই লক্ষ লক্ষ তৃণমূল কর্মী ভিড় করেনি। তারা সেই নেতা নেত্রীকেই বেশি পছন্দ করে যে বেশি পাইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ধরে। অতএব পছন্দের নেতা–নেত্রীর বিরোধিতা দল–বেদলের যেই করবে তার উপর এরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, দরকার হলে প্রাণ নিতেও কুণ্ঠা করবে না। সাফল্য মাথা ঘুরিয়ে দেয়। তখন অবস্থা এমনই যে, 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। সুপরামর্শ গায়ে তখন জ্বালা ধরায়। এ জ্বালা

তখন তিনি কাছের লোক, কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র

জুড়োতে সময় লাগে। তখন আর উপায় থাকে না। তৃণমূলের এখন অবস্থাও তাই। সাফল্য আছে, নেত্রীর সদিচ্ছা আছে। কিন্তু কোনওটাই কাজে আসছে না।

এরপর প্রশ্ন নেতা নেত্রীরা এদের পাইয়ে দেন কিভাবে? এর উত্তর তো আরও সোজা। নির্বাচনের আগেই ক্যারিশমাদার নেতা নেত্রীরা বুঝিয়ে দেন কার সঙ্গে বেশি প্রোমোটার, কার সঙ্গে পুরসভার কাজের অর্ডার, কার সঙ্গে থানা পুলিশ–পেশীশক্তি। এবার তোমরা বুঝে নাও কার জন্য খাটবে আর কার সঙ্গে থাকবে। এরপর কর্মীরা বুঝে নেন কার সঙ্গে থাকলে বেশি ফায়দা। এ রাজ্যের এটাই ভবিতব্য। গ্রামে তবু চাষবাস আছে। শহরে নেতাদের দাক্ষিণ্য ছাড়া আছেটা কি? না আছে শিল্প। না আছে স্বাধীনভাবে ব্যবসার সুবিধা। পেট চালাতে রোজগার তো চাই রে বাবা! তাই রাজনৈতিক রোজগারই ভরসা।

দলের সব কর্মীই কি ধান্দাবাজ। মোটেই না। এলাকায় এমন কিছু কর্মী আছেন যারা তৃণমূল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ও পথের শরিক হয়ে। কিন্তু অঞ্চলে অঞ্চলে তারা এখন সংখ্যালঘু। এলাকার ক্ষমতাধারী দাদা–দিদিরা এদের তেমন পাত্তা দেন না। তাই এরা এখন চুপ করে দলের পতনের অপেক্ষায় বসে আছেন। দুঃসময় ছাড়া এদের ডাকবে কে! কলকাতা পুরসভার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে ছবিটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সমস্ত এলাকায় তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে এ রাজ্যের ক্ষমতায় 'আনটেস্টেড' বিজেপি। খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এলাকায় তো বিজেপি জিতে দেখিয়ে দিয়েছে ভেতরে ভেতরে জনগণ কি চাইছে। বাংলার মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে। ৩৪ বছরের বাম অপশাসনের পর বাঙালি ভেবেছিল মমতা দেবীকে ধরে উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু বদলটা হল কই। এর চেয়ে এবার বিজেপিকে দেখি। কেন্দ্রে যখন এরাই আছে রাজ্যের কিছু সুরাহা হলেও হতে পারে। এ ভাবনা বাঙলা জুড়ে ছড়ালে সামনে তৃণমূলের সর্বনাশ আগত। কিন্তু একথা বুঝবে কে?

৮ হাজার ভেঙেও ঘুরে দাঁড়ালো নিফটি

শেয়ার সূচকে আপাত ডাউনট্রেন্ড কি শেষ?

শুদ্ধাশিস গুহ

ভারতীয় শেয়ার বাজার কী আপাতভাবে একটা বটম–আউট বা নিম্ন অবস্থান সম্পন্ন করল। বিশেষ করে গত প্রায় একমাস যাবৎ ভারতের বাজারে প্রায় ১০ % কারেকশন বা সংশোধনীর পরে সকলেই ভাবছিলেন কবে থামবে এই ধ্বংসলীলা। কারণ ক্রমাগত পতনের নিরিখে বেশ ভারী অবতরণের শেষ দেখতে উন্মুখ ছিলেন সকল লগ্নিকারী। তাদের মনে আপাতত খানিক স্বস্তি মিলেছে। যদিও দেশের শেয়ার বাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোকে সাময়িক বলে আখ্যা দিয়েছেন কিছু বিশেষজ্ঞ। এদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন পতনের জন্য ভারতের বাজার ওভারসোল্ড জোনে চলে গিয়েছিল, ফলে এই ঘুরে দাঁড়ানো শুধুমাত্র টেকনিক্যাল কারণেই সম্পন্ন হল। এর সঙ্গে বাজারের ভালো হয়ে ওঠার কোনও যোগ নেই বলেই এদের বিশ্বাস। এই অংশের কথানুযায়ী নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রায় এক বছর কেটে গেলেও দেশে সেভাবে কোনও ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে বাজারের যে উত্থান হয়েছিল সেটাই অনেক ছিল, প্রত্যাশার অনেক ওপরে। বাজার আশা করে রেজাল্ট বা ফলাফলের। সেদিক থেকে এখনও পর্যন্ত এই সরকার শেয়ার বাজার তথা লগ্নিকারীদের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। তাই এই পতনের গ্রাফ খুব স্বাভাবিক। যা আগামীদিনে অব্যাহত থাকার জোরদার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে । বিদেশিদের আশাভঙ্গ করাতেই ভারতীয় বাজারে পতনের সুনামি পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে বক্তব্য এই নেতিবাচক মনোভাব পোষণকারীদের। এমনকি আট হাজারের ঘর থেকে ভারতীয় নিফটি ঘুরে দাঁড়ানোর পর তা খুব বেশি হলে ৮৫০০–র কাছাকাছি যেতে পারে বলে বিশ্বাস এই শেয়ার তার্কিকদের।

এর বিরুদ্ধ মত বেশ প্রবলভাবেই বিদ্যমান। এই দলটি মনে করছে একবার জমি খুঁজে পাওয়ার পরে ভারতীয় সূচক ফের নয়া উদ্যোগে আগের উচ্চতার দিকে ছুটতে থাকবে। এদের ইতিবাচক মনোভাবের পিছনে বিচরণ করছে নরেন্দ্র মোদি সরকারের বাজার–প্রিয় ভূমিকা। এটা যে একেবারে অস্বীকার করা যাবে তা নয়। বরং রাজ্যসভাতে

অর্থনীতি

এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের উন্নতশীল দেশগুলির মধ্যে এক নম্বরে স্থান ভারতের। ভারতীয় নিফটি বা সেনসেক্স আগামী দিনে আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এমনকি এখনকার এই আতঙ্ককে দূরে ঠেলে আগামী মাস ছয়েকের ভিতরেই ভারতীয় সূচকদ্বয় সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছে যেতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। কেউ কেউ তো নিফটির আগামী এক–দুবছরের টার্গেট

দিচ্ছেন ১৫–১৬ হাজার। মানে আজকের যে বাজার তাই পালটে যাবে দ্বিগুণ আকারে। বলাইবাহুল্য, তার আগে হয়তো আর কিছুদিন এই বুল মার্কেটের মধ্যেই এই বেয়ার ফ্রেজ বা দুর্বল ভাগ দেখা যাবে। যার লেজ খুব সীমিত বলেও মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে যতই একদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার দুর্বলতা সত্ত্বেও এই সরকার অর্থনীতির উদার নীতির পথকে সুগম করতে যে দায়বদ্ধতা দেখাচ্ছে তা নজর এড়িয়ে যাচ্ছে অনেকেরই। আর সরকারের এই সবল ভূমিকা বা দায়বদ্ধতার প্রশংসা করতে দেখা যাচ্ছে বিদেশিদেরও। তারা বলছেন বিশেষজ্ঞ (মার্ক ফেভারের মতো আর্থিক পণ্ডিতরাও এর অন্তর্ভুক্ত) গেল গেল রব তুলুক না কেন বাজারের পক্ষে আর বেশি নিচে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই অনুমান করা হচ্ছে। হতে পারে নিজেদের পছন্দসই শেয়ার সুলভমূল্যে হাতে পাওয়ার জন্য এই ভীতি ছড়ানো হচ্ছে সুকৌশলে। কারণ বাজার যখন খুব ভালো জায়গায় চলে যায় তখন যেমন জাহাজ কিংবা আদার ব্যাপারী প্রত্যেকের মুখে শোনা যায় আরও ভালো সময় আসছে, তেমনই পতনের বাজারে এই অংশটাই চিৎকার করে বলতে থাকে আরও খারাপ দিন আগত। অর্থাৎ এরা হল গিয়ে ঢেউয়ের সঙ্গে চলা পাবলিক। নিফটি যখন ২০০৮–৯ এ ২৩০০ এর কাছে গিয়েছিল তখন এরাই বলছিল নিফটি নাকি হাজার হয়ে যাবে, কিংবা তার চেয়েও নিচে যাবে। একভাবে বাজার বাড়লে এই অংশটা যেন বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। তাই শেয়ার বাজারে একটা চালু কথা আছে বাজার নিয়ে যখন সবাই একযোগে আলোচনা শুরু করবে তখন বুঝতে হবে উলটো কিছু ঘটতে চলেছে। এই বাজার যখন ওপরের দিকে থাকবে তখন অত্যধিক আলোচনা মানে পতনের সময় আগতপ্রায়। একভাবে বাজারের রসাতলে তলিয়ে যাওয়া নিয়ে সব্বাই যখন মুখরোচক চর্চা শুরু করবে তখন কিন্তু জানতে হবে ঘুরে দাঁড়ানো বা কেনার সময় এসে গিয়েছে। দীর্ঘদিন বাজারে একজন ট্রেডার–ইনভেস্টর হিসেবে থাকার কারণে আমার ধারণা এখন দ্বিতীয় সময়টি এসে গিয়েছে। অর্থাৎ এখন কিনে খেলতে হবে। বাজারের যে সাময়িক মন্দা এসে বুল মার্কেটকে তমসাচ্ছন্ন করছিল তার হয়তো পরিসমাপ্তি ঘটল।

তবে এই আশাভরসার কথার মাঝে সতর্ক থাকতে হবে অবশ্যই। যাতে নিজেদের পুঁজিকে সুরক্ষিত রাখা যায়। কারণ বিপদ যে পুরোপুরি কেটে গিয়েছে তা বলা বলে চলে না। বরং বলা যেতে পারে বিপদের ঘনত্ব খানিকটা স্তিমিত হয়েছে। এখন অপেক্ষা করতে হবে সেইসব বিপদ থেকে আগাম সাবধান থাকার। এখনকার যে বিপদ মানে ম্যাট নিয়ে বিদেশিদের ওপর কর চাপানোর ঝামেলা আপাতত সরলো বলে বোঝা যাচ্ছে। তবে না আঁচালে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া দুষ্কর। তাছাড়া লোকসভাতে পাশ হলেও জমি বিল, জিএসটি বিল ইত্যাদি যা নিয়ে রাজ্যসভাতে সমস্যা ছিল তা কিছুটা কেটে যাওয়ার ছবি দেখা যাচ্ছে সম্প্রতি। তৃণমূল–সহ কিছু আঞ্চলিক দল শাসক দলের পাশে দাঁড়ানোয় এই পড়ে–পাওয়া–সুযোগ পাচ্ছে মোদি সরকার। যা সার্বিকভাবে বাজারের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব আরামপ্রদ হবে। বাজার যে নিচে আসবে তার অবস্থান খুব বেশি দূরে ছিল না গত কয়েকমাসের নিচের থেকে। আসলে গতবছরের সেপ্টেম্বর থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত চলাকালীন সময়কালে ভারতীয় নিফটি ৭৮০০–কে ভেঙে বন্ধ করেনি। গত ৭ মে বাজার আট হাজারের ঘর ভেঙেও পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়ায়। সেই প্রেক্ষিতে এটা মনে করা পারে বাজারের ওপরের দিকটা যদি ৮৮৫০–৯২০০–র মতো দাঁড়ায় তাহলে এর লেজটা ওই ৭৮০০–৮০০০–র মধ্যেই। কারণ এই দুই জায়গা থেকেই বাজার যেমন বারংবার পড়েছে তেমনই আবার ঘুরেও দাঁড়িয়েছে।

এই লেখা সর্বশেষ পর্যায় থাকা পর্যন্ত ভারতীয় শেয়ার বাজারে কারেকশন বা নিম্নতল ধরে নেওয়ার কাজ চলছে। যাতে পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বাজার আর ৮ হাজারের নীচে আসবে না। বরং আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াবে নিফটি এবং সেনসেক্স। তবে এই মে মাস জুড়ে ভোলাটিলিটি বা অস্থিরতা চূড়ান্তভাবে অবস্থান করবে। ফলে একদিন বাজার যদি দুশো পয়েন্ট বাড়ে পরের দিন একশো পয়েন্ট পড়ে যেতে সময় নেবে না। ফলে এই সময় মেপে কাজ করতে হবে। বেশি সাহস না দেখানোই উচিত। কোনও ট্রেডারকেই বেশি মাল কেনা বা বহন করা উচিত নয়। বরং ধীরে ধীরে শেয়ার কিনে (ভ্যালুয়েশন অনুযায়ী) নিজেদের পোর্টফোলিওকে মজবুত করে তুলতে হবে এই সময়। ব্যাঙ্কিং সেক্টরকে জোর দিতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে সামনেই রয়েছে আরও একবার সুদের হার কমার গল্প। প্রসঙ্গত এর আগে দু–দুবার ২৫ বেসিস পয়েন্টে সুদের হার কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এবার আরও এক দফা হওয়ার জোর সম্ভাবনা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৬ মে – ২২ মে, ২০১৫

মেষ : আপনার পরিপূর্ণ কাজের মধ্যে বুদ্ধি ও দায়িত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মনের মতো ফল পাবেন না। লেখাপড়ায় ভালো ফল হবে।

বৃষ : প্রচণ্ড মাথা গরম হবে কিন্তু আপনাকে সংযত হতে হবে। অতিরিক্ত রাগ জেদের জন্য বুদ্ধির ভুল হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি এবং ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মিথুন : পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কর্কট : কর্মস্থলে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয়ে বাধা। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থ আনয়নে বাধা আসবে।

সিংহ : বর্তমান সময়টি আপনার পক্ষে শুভ নয়। অকারণে বিরোধ–বিতর্ক লেগেই থাকবে। আত্মীয়–স্বজনদের এড়িয়ে চলুন। চাকরিতে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারণার যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ হলেও সাবধানে থাকবেন।

কন্যা : বিবিধ সমস্যা থাকলেও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। কোনরকম দায়িত্বের ঝুঁকি নেবেন না। গৃহে মাঝে মধ্যে কলহ–বিবাদ লেগে থাকবে, মায়ের শরীর ভালো থাকবে না। জমি–জমা ও ঘর–বাড়ি নিয়ে পূর্বের ঝামেলার অবসান হবে। শিক্ষায় ফল ভালো হবে।

তুলা : বেকারত্বের অবসান হবে। দৈব–দুর্ঘটনা ও রক্তপাতের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না, পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। জল থেকে সাবধান থাকবেন। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

বৃশ্চিক : সাবধানে চলাফেরা করবেন। রক্তপাতের যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে কথা বলবেন খুব চিন্তা করে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন, ভাই বোনদের থেকে সাহায্য পাবেন। বাধার মধ্যেও শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে।

ধনু : পাকাশয়ের পীড়ায় ও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগে কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে সমস্যা থাকলেও আপনি আর্থিক উন্নতি করতে পারবেন।

মকর : মনের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করুন। ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে হবে। সামান্য কারণেই মতবিরোধ দেখা দেবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে উপযাচক হয়ে এগিয়ে যাবেন না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না।

কুম্ভ : ভাই–বোনের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ও ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভালো ফল পাবেন না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন ভাবে এখন কিছু না করাই উচিত। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিত লাভযোগ রয়েছে।

মীন : ক্রোধকে সংযত করুন। নতুন বন্ধু লাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যা আসবে। আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ উন্নতি হবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। সন্তান বিষয়ে সুখ ও আনন্দ লাভ।

ন্যাভাল কমান্ডে ২৯৯ ট্রেডসম্যান

মাধ্যমিক ছেলেমেয়ের জন্য

মুম্বাইয়ের ন্যাভাল ডকইয়ার্ড 'ট্রেডসম্যান (ফিল্ড)' পদে ২৯৯ জন লোক নিচ্ছে। ইংরিজি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং নিয়ে থাকতে হবে।

কোন ট্রেডের বেলায় কোন কোন ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং নিয়ে থাকতে হবে। ইলেক্ট্রিক্যাল ফিটার ট্রেডের বেলায় পাওয়ার ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডে, বয়লার মেকার ও প্লেটার ট্রেডের বেলায় শিপরাইট স্টিল ট্রেডে, ইঞ্জিন ফিটার ট্রেডের বেলায় ফিটার ট্রেডে গ্যাস টারবাইন ফিটার ও ইন্টারন্যাল কম্বিউশন, ইঞ্জিন ফিটার ট্রেডের বেলায় ডিজেল মেকানিক ট্রেডে, মেশিনারি কন্ট্রোল ফিটার ট্রেডের বেলায় ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক ট্রেডে, প্যাটার্ন মেকার ট্রেডের বেলায় প্যাটার্ন মেকার ট্রেডে, কম্পিউটার ফিটার ট্রেডের বেলায় আই.টি অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স সিস্টেম মেন্টেন্যান্স ট্রেডে ইলেক্ট্রনিক্স ফিটার ও সোনার ফিটার ট্রেডের বেলায় মেকানিক (রেডিও/র‍্যাডার/এয়ারক্রাফট) ট্রেডে, মিলরাইট ট্রেডের বেলায় এম.এম.টি.এম ট্রেডে। পেইন্টার ট্রেডের বেলায় পেইন্টার (জি) ট্রেডে, রিগার ট্রেডের বেলায় রিগার ট্রেডে, শিপ ফিটার ট্রেডের বেলায় শিপরাইট উড, ওয়েল্ডার ট্রেডের বেলায় ওয়েল্ডার ট্রেডে ও ব্ল্যাকস্মিথ ট্রেডের বেলায় ফোর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটমেন্ট ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট (এন.এ.সি) ট্রেনিং করে থাকতে হবে।

বয়স হতে হবে ২০–৫–২০১৫'র হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসি'রা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীর ১০ বছর আর প্রাক্তণ সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ভালো স্বাস্থ্য থাকতে হবে। ছেলেদের বেলায় এন্ডিওরেন্স টেস্ট হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মেয়েদের বেলায় এণ্ডিভারেন্স টেস্ট হবে না। মূল মাইনে : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ২৯৯টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিক্যাল ফিটারে ৯টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ওবিসি ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১। বয়লার মেকার ১১টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ওবিসি৩)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১। প্লেটার ৬৩টি (জেনাঃ ৩৩, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৪, ওবিসি ১৭)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৬, খেলোয়াড় ৩, প্রতিবন্ধী ২। ইঞ্জিন ফিটার ১১টি (জেনা ৮, তঃউঃজাঃ ৩)। এর

কাজের খবর

মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১। গ্যাস টারবাইন ফিটার ৩টি (জেনাঃ ২, ওবিসি১)। ইন্টারন্যাল কম্বিউশন ইঞ্জিন ফিটার ১৫টি (জেনাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৪, ওবিসি৩)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ১। মেশিনারি কন্ট্রোল ফিটার ২টি (জেনাঃ ১, ওবিসি ১)। প্যাটার্ন মেকার ১১টি (জেনাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ১, ওবিসি ৩)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১। কম্পিউটার ফিটার ১টি (জেনাঃ)। ইলেক্ট্রনিক ফিটার ৩৭টি (জেনাঃ ২১, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৩, ওবিসি ৯)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৩, খেলোয়াড় ১। সোনার ফিটার ৩টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১, ওবিসি ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১। পেইন্টার ১৯টি (জেনাঃ ১৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ৩)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ২। রিগার ১৯টি (জেনাঃ ১৭, তঃউঃজাঃ ২)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১। শিপ ফিটার ৩২টি (জেনাঃ ১৬, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৪, ওবিসি ৬)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৩, খেলোয়াড় ১, প্রতিবন্ধী ১। শিপরাইট ২৮টি (জেনাঃ ১৮, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২, ওবিসি ৬)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ২, খেলোয়াড় ১, প্রতিবন্ধী ১। ওয়েল্ডার ২৯টি (জেনাঃ ১৫, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ৩, ওবিসি ৬)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৩, খেলোয়াড় ১, প্রতিবন্ধী ১। ব্ল্যাকস্মিথ ৪টি (জেনাঃ ৩, ওবিসি ১)।

দরখাস্ত দেকে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের মোট শূন্যপদের ১০ গুণ প্রার্থীকে প্রথমে লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্নহবে মাধ্যমিক মানের। মোট ১৩০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : জেনারেল সায়েন্স, অঙ্ক, জেনারেল নলেজ ও রিজিনিং। প্রশ্ন পত্র তৈরি হবে ইংরেজি ও হিন্দিতে। সফল হলে ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষার কল লেটার ই–মেল আই.ডি. তে পাঠানো হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১১ মে থেকে ২০ মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.godiwadabhartee.com এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার, শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিট, এনএসি সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমানপত্র জেপিইজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের এই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ও ইউনিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রিন্ট করে নেবেন।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে ৬১২ নার্স

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে কাজের জন্য 'স্টাফ নার্স, গ্রেডII পদে ৬১২ জন তরুণী নেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিল বা ভারতীয় নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারির সার্টিফিকেট কোর্স পাস তরুণীরা আবেদন করতে পারেন। বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।মূল মাইনে ৭,১০০–৩৭,৩০০ টাকা ও গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬১২টি (তঃ জাঃ ২০৭, তঃউঃজাঃ ৭৫, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ২৬৩, প্রতিবন্ধী ৬৭)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : Advt No. R/N/02/2014, Dated 17–02–2014.

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৭ মে থেকে ১৮ মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.wbhrb.in এজন্য বৈধ্য একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে।

তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ নির্দিষ্ট টাকা দিতে হবে। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওপরের ওই ওয়েবসাইটে।

অগ্নি ব্যবস্থাপনার পেশাদার গড়তে সরকার স্বীকৃত কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোটা রাজ্য জুড়ে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। তাই অগ্নি ব্যবস্থাপনার পেশাদার কর্মীর চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু সেই তুলনায় দক্ষ কর্মী কম। এই সমস্যা সমাধানে সরকারি সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরি শিক্ষা পর্ষদের স্বীকৃতিতে গত বছর থেকে এ রাজ্যে প্রথম অগ্নি ব্যবস্থাপনার পেশাদার কার্যক্রম চালু হয়েছে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (IISWBM)'। ২০১৩–১৪ সেশনে এই কোর্সের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের মন্ত্রী জাভেদ খান। পাঠক্রম তৈরি করেন অগ্নি নির্বাপণ বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা। এই কোর্সের ট্রেনিংপ্রাপ্ত তরুণ তরুণীরা এর মধ্যেই কাজের জগতে সাড়া ফেলেছে।

এবছর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সরকারি পরিবহন সংস্থাগুলির ডিপো ও ওয়ার্কশপগুলির 'ফায়ার অডিট' করানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের। ডিপোর বাসগুলিতে আগুন নেভানোর কী ব্যবস্থা আছে, তা পর্যালোচনা করে দেখবে ওই কর্মীরা। ৩ মাসের মধ্যে অডিটের কাজ শেষ করা হবে। বিভিন্ন ডিপোর অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে এই ইনস্টিটিউটের ফায়ারম্যানেজমেন্টের বিশেষজ্ঞরা মার্কস দেবেন। পেশাদারি কাজকে আরো প্রসারিতকরার জন্য 'IISWBM'এ এ বছরের সেশনে ফায়ার ম্যানেজমেন্টের অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেওয়া শুরু হয়েছে। বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি কোর্সে পাশরা ভর্তির জন্য দরখাস্ত করতে পারেন। এখানে ফায়ার ম্যানেজমেন্টের ১ বছরের কোর্স পড়ানো হচ্ছে দিবা বিভাগে আর সান্ধ্য বিভাগের কোর্সের মেয়াদ ১৮ মাস। প্রার্থী বাছাই করা হবে গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। এই গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ হবে ৯ জুলাই।

নির্বাচিত প্রার্থীদের সফল তালিকা বেরোবে ১৫ জুলাই। কোর্সের উদ্বোধন হবে ২৯ জুলাই আর ক্লাস শুরু হবে ৩০ জুলাই। কোর্স কো–অর্ডিনেটর অধ্যাপক সর্বাণী মিত্র জানান, পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিস আইন অনুসারে যেকোনও ধরনের বহুতল বাড়ি, মাল্টিপ্লেক্স, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র, স্বাস্থ্য ও শিল্পক্ষেত্র–সহ জরুরি পরিষেবা বিভাগে অগ্নি ব্যবস্থাপনা পেশাদারদের নিয়োগ এখন বাধ্যতামূলক হওয়ায় এ রাজ্যে এই পেশায় চাকরির সুযোগ ক্রমশ বাড়ছে। রাজ্য সরকারও এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে। ভর্তির জন্য ফর্ম ও প্রসপেক্টাস এখন পাওয়া যাচ্ছে। ৩০০ টাকা দিয়ে এই ফর্ম পেতে পারেন হাতে–হাতে নিচের ঠিকানা থেকে। অথবা ডাকযোগেও জমা দিতে পারেন। ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন ওয়েবসাইট থেকেও। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ জুন। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায় : ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, কলেজ স্কোয়ার (ওয়েস্ট), কলকাতা–৭০০০৭৩। ফোন : (০৩৩)৪০২৩–৭৪৭৪, ৮৩৩৬০১০০০৫। ওয়েবসাইট : www.iiswbm.edu.

ট্রাকের ধাক্কায় রেলিং ভাঙল কুলিক সেতুর

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের কুলিক সেতুর রেলিং ভাঙল পণ্যবাহী ট্রাক। রায়গঞ্জের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর রয়েছে এই কুলিক সেতু। কলকাতা থেকে উত্তরপূর্বাঞ্চলের যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই সেতুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সেতুটির বেহাল অবস্থা থাকায় এদিন দুর্ঘটনার পর জনমানসে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। রবিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় কলকাতা গৌহাটিগামী পণ্যবাহী একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে কুলিক সেতুর রেলিং–এ ধাক্কা মারে। প্রায় ১০ ফুট রেলিং ভেঙে ঝুলতে থাকে ট্রাকটি। প্রাণে বাঁচেন ট্রাকের চালক জগদীশ সিং। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকের চালক জগদীশ সিং বলেন, সেতুর সামনের দিকে ফাটল নজরে আসায় সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনার পর থেকেই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তিনটি উদ্ধারকারী যান এসে লরিটিকে রেলিং থেকে টেনে তোলে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটিকে সরানোর পর বেলা আড়াইটা নাগাদ যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

চোলাই ঠেক ভাঙতে গিয়ে আক্রান্ত তৃণমূল সদস্য

মেহবুব গাজি

এলাকায় রমরমিয়ে চলা চোলাই ভাটির প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন খোদ শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য। এমনকি আক্রান্ত পঞ্চায়েত সদস্য থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ না নিয়ে উল্টে গ্রেপ্তারির হুমকি দেন বলে অভিযোগ। পুরো ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দা ও পঞ্চায়েত প্রধান। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে পাথরপ্রতিমার দিগম্বরপুর পঞ্চায়েতের দক্ষিণ দুর্গাপুরে। অভিযোগ না নিয়ে গ্রেপ্তারির হুমকি দিয়ে কাঠগড়ায় ঢোলাহাট থানার ওসি জগদীশ দাস। আক্রান্ত তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য আব্বাসউদ্দিন গাজি স্থানীয় নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। আক্রান্ত সদস্যের মোবাইল ফোনটাও লুট করেছে চোলাই মাফিয়ারা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দক্ষিণ দুর্গাপুর গ্রামে গত বছর পাঁচেক ধরে রমরমিয়ে চলছে গোটা পাঁচেক চোলাই ঠেক। এখানকার তৈরি চোলাই ছড়িয়ে পড়ে গোটা সুন্দরবনে। চোলাই তৈরির জেরে এলাকার বাসিন্দারা অতিষ্ঠ। একাধিকবার স্থানীয় থানায় অভিযোগও করেছেন বাসিন্দারা। কিন্তু স্থানীয় ঢোলাহাট থানা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। উল্টে পুলিশের একাংশের মদতে চোলাই কারবারে মদত দিয়েছে। পুলিশের আশির্বাদী হাত মাথায় থাকায় চোলাই মাফিয়ারা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এই কারবারের মূল পান্ডারা হল সুব্রত হালদার, অমিত হালদার, বিশ্বনাথ খাঁড়ারা।

পঞ্চায়েত সদস্য আব্বাসের নেতৃত্বে এদিন গ্রামবাসীরা চোলাই ভাটি ভাঙার জন্য এলাকায় যান। এলাকায় দেখা মাত্র চোলাই কারবারিদের মদতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি আক্রমণ করে পঞ্চায়েত সদস্যকে। আক্রমণ করা হয় বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীকে। কেড়ে নেওয়া হয় সদস্যের মোবাইল ফোন ও টাকা। ভয়ে সদস্য–সহ গ্রাবাসীরা পিছু হটেন। ঢোলাহাট থানায় অভিযোগ জানাতে যান সদস্য–সহ বাসিন্দারা। সদস্য আব্বাসউদ্দিনের অভিযোগ, 'থানায় গিয়ে আমরা আক্রমণকারী চোলাই কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে চাই। থানার ওসি জগদীশ দাস অভিযোগ না নিয়ে আমাদের গ্রপ্তারের হুমকি দেন। কোনও অভিযোগ নেননি পুলিশ।' পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান রবীন্দ্রনাথ বেরা বলেন, 'পুলিশকে বারে বারে চোলাই ঠেক ভেঙে দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। মাটির নিচে গর্ত করে কয়েক হাজার লিটার চোলাই মজুত আছে গ্রামে। পাইপ দিয়ে তোলা হয়। পুলিশের ভূমিকায় আমরা হতাশ।' জেলার এক পুলিশ কর্তা বলেন, চোলাই ঠেকের বিরুদ্ধ ধারাবাহিক অভিযান চলে। ওই গ্রামের ঠেক নিয়ে খোঁজ চলছে।

খাবার ওল থেকে সুদৃশ্য বৃহৎ ফুল

অশুভ সংকেত কি?

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত সাউথ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকারী পাড়ায় শুষেন অধিকারীর বাড়িতে সম্প্রতি দুটি বড় সাইজের খাবার ওল থেকে অপূর্ব সুন্দর ফুল ফুটতে দেখে গ্রামের লোক হতবাক। বাগান থেকে খাবার জন্য ওই পরিবারের সদস্যরা দুটি ওল তুলে রেখে ছিল ঘরের মধ্যে খাটের তলায়। কয়েকদিন আগে একটা বিকট গন্ধ বের হতে, খাটের তলায় উঁকি মেরে দেখে বাড়ির লোকজন। ম্যাজিকের মতো অপূর্ব সুন্দর রঙীন ফুল ফুটে আছে ওল দুটোয়। ওল দুটিকে বাড়ির উঠানে রাখা হয়। সেই সুদৃশ্য ফুল দেখতে অনেকেই ভিড় জমান অধিকারী পাড়ায়। ছড়ায় নানা গুজব। এলাকার বয়স্ক মানুষরা বলেন, বাপের জন্মে এমন ফুল দেখিনি।

বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতর সভাপতি স্বপন রায় বলেন, ছোটবেলা থেকে আমাদের বাগানে ওল চাষ হত, কই কোনদিন এমন ফুল দেখিনি। অনেকে বলেন, বাঁশ গাছে যেমন ফুল হলে মড়ক লাগে, তেমনি ওলে ফুল মানে অশুভ সময়ের সংকেত দিচ্ছে। অনেকে তার সঙ্গে যোগ করে তাই ভূমিকম্পে বারবার আমাদের রাজ্য নড়ে উঠছে। জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক তপন অধিকারী এই প্রসঙ্গে জানালেন, ওলে ফুল হওয়া কোনও কুসংস্কার বা অশুভ সংকেত নয়। বিশেষ প্রজাতির ওলে এই ফুল সিজনে হয়। এটাকে ভৌমপুষ্প দণ্ড বলে। কিছুদিনের মধ্যে ওই ফুল শুকিয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তন্ত্র জ্যোতিষ তপন শাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলেন, বাঁশ গাছে ফুল হওয়া যেমন অশুভ, তেমনি ওলে ফুল ফোটা বিষয়টিও স্বাভাবিক বা শুভ নয়। ওই ওল অবশ্যই না খেয়ে ফেলে দেওয়া উচিত। তবে এলাকার অনেক নার্শারী ব্যবসায়ীরা ওলের সুদৃশ্য ফুল দেখে অবাক হয়েছেন। অনেকের মতে দামি অর্কিডেরও এত সুন্দর ফুল হয় না।

৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল দখলে নিল ৩২টি

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

প্রায় ১ মাস যাবৎ আলিপুর বার্তার প্রতিনিধি বেশ কিছু নিশ্চিত জয়ী প্রার্থীদের সমীক্ষার অঙ্ক কষেছিলো। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই অক্ষরে অক্ষরে তা মিলে গেল।

রাজপুর সোনারপুর পুরসভার নির্বাচন এবার নির্বিঘ্নে কেটেছে। ছিল না বহিরাগত মাসলম্যান গুণ্ডা বাইক বাহিনী বা মাস্কেট ম্যানদের দাপাদাপি। প্রার্থীরা বলেন বিগত পাঁচ বছরে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যে ধরণের উন্নয়নের কাজ হয়েছে তার ফলশ্রুতি হিসাবে ওয়ার্ডের মানুষজন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমাদেরকে ভোট দিয়েছে। ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র তিনটিতে হেরেছে তৃণমূল প্রার্থীরা। এই সম্ভাবনার কথা ভোটের আগেই আলিপুর বার্তার প্রতিনিধিরা জানিয়েছিলেন এলাকা সমীক্ষা করে। ১৬ নং ওয়ার্ডে তপতী চক্রবর্তী হারলেন গতবারের কাউন্সিলার স্বামী কাঞ্চন চক্রবর্তীর নামে ভুরি ভুরি অভিযোগের আঘাতে। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী উত্তম সরকার হেরেছেন তাঁর ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডে জিতেছেন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নির্দল প্রার্থী।

৪ নং ওয়ার্ড গড়িয়া স্টেশন, পাঁচপোতা বিভাষ মুখোপাধ্যায় (মনু)। নবান্ন থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত 'মনু মুখার্জী' নামে পরিচিত। গতবার ছিলেন ২নং ওয়ার্ডে। এই আসনটি মহিলা দ্বারা সংরক্ষিত হবার কারণে বিভাস বাবুকে দেওয়া হয় ৪নং ওয়ার্ডে। ভোটের আগে বলেন আমি হাসতে হাসতে জিতে যাব। কারণ বিগত ৩৭ বছরের সিপিএমের দখলে থাকা এই ওয়ার্ডে রাস্তাঘাট, পানীয়জল, আলো, কোনও রকম পরিষেবা পায়নি বাসিন্দারা। এছাড়া ৪ নং ওয়ার্ড মনুবাবুর মাদার ল্যান্ড। ২৮ তারিখ বিকালে রেজাল্ট বেরনোর পর তিনি বলেন এলাকার মানুষের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের পরিচিতির ফলে মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছে। সব চাইতে গর্বের বিষয় হল এখানকার সিপিএমের কর্মীরা আমাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন। গতবারের ২ নং ওয়ার্ডের কাজের সুখ্যাতি ৪ নং ওয়ার্ডে ছড়িয়ে গিয়েছে। ভোটের গণনার শুরু হতেই চমক দিয়েছেন মনু বাবু তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমকে ৪২৭১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে সিপিএমের ৩৭ বছরের দুর্গকে ছাড়খার করে দিয়েছেন মনু। তিনি বলেন সেদিন বৃষ্টি আর ভূমিকম্প যদি না হত তাহলে আমি আরও ১ হাজার ভোট বেশি পেতাম। মানুষ ভয়ে বের হয়নি।

ওয়ার্ড নং ১২— প্রণবেশ মণ্ডল, পেশায় আইনজীবী। নতুন প্রার্থী হলেও এলাকার মানুষের জন্য দিন রাত আপদে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রণবেশ বাবু তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমকে ৮৬৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এই ওয়ার্ডে প্রণবেশ বাবুকে বেশি করে ভোট আদায় করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয় দুটি কারণে। একদিকে সিপিএম, অন্যদিকে গতবারের তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী সুজিত মণ্ডল এবার টিকিট না পাওয়ার জন্য জোড়াপাতা নির্দলের খাতায় নাম লিখিয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং নতুন প্রার্থী হিসাবে দুজনকে টক্কর দিয়ে জিতে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন প্রণবেশ মণ্ডল।

১৫ নং ওয়ার্ডে— অমিতাভ চৌধুরী (পিটু) দুঁধে রাজনীতিবিদ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমকে পরাস্ত্র করল ৩৬৭৬ ভোটের ব্যবধানে। গতবারে তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে ২৫ নং ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছিলেন কিন্তু এবারে মহিলা ওয়ার্ড হয়ে যাবার দরুণ জেলার শীর্ষ নেতারা তাকে ১৫ নং ওয়ার্ডে প্রার্থী করেন। এই নতুন ওয়ার্ডে গিয়েও পিটু ম্যাজিক ভোটে জয়ী হয়েছেন।

১৭ নং ওয়ার্ড— ইন্দু ভূষণ ভট্টাচার্য। গতবার জয়ী হয়ে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। চেয়ারম্যান থাকাকালীন এলাকার কোনও মানুষ পুরসভার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়নি। সেই কারণে এবারেও ইন্দুবাবু তার বহু দিনের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও উন্নয়নের হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে মানুষের কাছ থেকে ভোট আদায় করে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমকে ১৬৮৬ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হলেন।

১৯ নং ওয়ার্ড— শিবানী ঘোষ। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমকে পরাজিত করলেন ৪৫৯ ভোটে। শিবানী দেবী একেবারেই নতুন তৃণমূলের পার্টিতে। এখানেও সিপিএমকে হারাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

২০ নং ওয়ার্ড— ডাঃ পল্লব দাস। গতবারে এই ওয়ার্ড থেকে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। এবার তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমকে ১৫৫৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করলেন। এই ওয়ার্ডে সিপিএমের তরফে দোর্দন্ড প্রতাপ প্রার্থী রাহুল ঘোষকে দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু পল্লব বাবুর ওয়ার্ডে উন্নয়নের কাজ প্রচুর হলেও অন্যদিকে সমাজসেবা ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির জন্য অনেক বেশি ভোট পেয়েছেন।

রাজপুর সোনারপুর

২২ নং ওয়ার্ড— অতসী পাল। গৃহবধূ একেবারেই রাজনীতিতে নতুন। তিনি এবারে সিপিএমকে ৬২২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এই ওয়ার্ডে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল জোড়াপাতা চিহ্নর হয়ে প্রার্থীকে দাঁড় করান হয়েছিল শেষ পর্যন্ত টিকতে পারল না হার মানতে হলো জোড়া পাতাকে।

২৫ নং ওয়ার্ড— সোনালী রায়, নতুন প্রার্থী হলেও তৃণমূলের পার্টিতে অনেকদিন ধরে জড়িত ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁর জ্ঞান ছিল। ওয়ার্ডে বিভিন্ন ধরনের মানুষের কাজ করে সুখ্যাতি কুড়িয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমকে ৯২৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন।

২৬ নং ওয়ার্ড— টুম্পা দাস, গতবারে জয়ী হয়েছিলেন এবারে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমকে পরাজিত করেন ৪৪৭ ভোটের ব্যবধানে। এই ওয়ার্ডে উন্নয়নের কোনও খামতি রাখেননি টুম্পা। এই কারণে দ্বিতীয়বার জয়ী হলেন।

এবার জীবন মুখোপাধ্যায়ের দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে ১৮টি ওয়ার্ড থেকে জয়ী হল ১৫টি ওয়ার্ড। তিনটি ওয়ার্ড পরাজিত হল। এছাড়া বিধায়ক ফিরদৌসী বেগমের উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে ১৭টি ওয়ার্ড থেকে জয়ী হল ১৭টি ওয়ার্ড। দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের দুটি ওয়ার্ড ১৬, ২৪ সিপিএমের দখলে এল এবং ৯ নং ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী জয়ী হল। গণনার শেষে জয়ী প্রার্থীরা বলেন আমাদের জয়ের সবচেয়ে বেশি করে কৃতিত্ব দেব আমাদের তৃণমূলের কর্মীদের। ওদের চেষ্টায় আমরা ভোটে জয়ী হয়েছি। তারা আমাদের মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছে রাত দিন কঠোর পরিশ্রম করে। গণনার কেন্দ্র থেকে একে একে বেরিয়ে আসেন জয়ী প্রার্থীরা। তাঁরা কর্মী দলের কাছে যেতেই শুরু হয়ে যায় কর্মীদের উল্লাস। শুরু হয় সবুজ আবির খেলা ঢাক ঢোল পেটানো।

মহানগরে

কলকাতা পুরসভার শপথনামা পর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা পুর নিগম আইন ১৯৮০–র ৭৯ নম্বর ধারানুযায়ী কলকাতা পুরসভার নতুন পুরবোর্ডের ১৪৪ জন নবনির্বাচিত পুরপ্রতিনিধিকে দু'দিন ব্যাপী আনুগত্যের শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যের পুর সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। শ্রী গোপালিকা বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দু এই চার ভাষায় ওয়ার্ডের ক্রমানুসারে একে একে পুর প্রতিনিধিদের শপথবাক্য পাঠ করান। ১৪৪ জন পুরপ্রতিনিধির মধ্যে ইংরেজিতে শপথ গ্রহণ করেন মোট ১৫ জন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অলোকানন্দা দাস (৩৪), জোকা আই আই এসে'র প্রাক্তন ছাত্র সন্দীপন সাহা (৫২), উপ–মহানাগরিক ইক্‌বাল আহমেদের কন্যা সানা আহমেদ (৬২), কলকাতা হাইকোর্টের আরেক আইনজীবী দেবলীনা বিশ্বাস, প্রাক্তন বিমান সেবিকা অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহম্মদ ইকবালের ছেলে শামস্ ইকবাল প্রমুখ। হিন্দিতে শপথ গ্রহণ করেন মোট ১০ জন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন, সীতা জয়শোয়ারা (১) ও মহম্মদ আনোয়ার খান (৮০)। উর্দুতে শপথ গ্রহণ করেন মোট ১০ জন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন, শগুফতা পরভিন (৪৩) ও ফৈয়াজ আহমেদ খান (৬৬) প্রমুখ। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় ও পুর অধ্যক্ষা মালা রায় বাংলাতে শপথ গ্রহণ করেন সর্বপ্রথমে। বাকি সমস্ত পুরপ্রতিনিধি বাংলাতে শপথ গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত, গত ২০১০–এ শপথ বাক্য পাঠ করান তৎকালীন রাজ্য সরকারের পুর সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এনআইপিএসের এক অভিনব উদ্যোগ

দিপা কর্মকার

গত ১৩ই মে ২০১৫ বুধবার সল্টলেকের এনআইপিএস হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে আয়োজিত হল গ্যাস্ট্রোনোমিক্স ২০১৫– যা একটি অভিনব ইন্ট্রা–কলেজ শেফ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ২০ এপ্রিল,২০১৫তে ৪২ টি দল নিয়ে। তারপর বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে চূড়ান্ত বাছাই–এর পর ১৩টি দল ফাইনালের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। প্রত্যেকটা স্তরে প্রতিযোগীদের জন্য বিভিন্ন থিম ও তার আনুষঙ্গিক উপাদান ছিল যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে তারা তাদের ভিতরে লুকিয়ে থাকা প্রতিভার মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছিল তাদের তৈরি ডিসের মাধ্যমে।

গ্যাস্ট্রোনমিক্স ২০১৫ র ফাইনালে উঠে আসা সেরা ১৩টি গ্রুপ যাদের তৈরি ডিস বর্ণে–স্বাদে– গন্ধে অন্যদের বাজিমাত করেছিল,কিন্তু সেরার মধ্যে আসল সেরা কে তাই দেখতে আবার তাদের মধ্যে শুরু হয়েছিল অন্তিম প্রতিযোগিতা –যেখানে শুধু ভারত নয় সুদূর স্পেন, জাপান, আরব, ইতালির খাবারের গন্ধ স্বাদ তুলে ধরল। গ্রিলড শ্রিম্প, বেকড পোম্পানো, ওসিয়ান ডিলাইট,কোরিয়ান স্টাইল ফ্রাইড বেকন, কটেজ চিজ, রক পর্ক ধোকলা প্রভৃতি বিভিন্ন ডিসে যা দেশি–বিদেশির অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা গিয়েছিল–যা এক কথায় অসাধারণ। বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার ললিত গ্রেট ইস্টার্ন এক্সিকিউটিভ শেফ মধুমিতা মহান্ত, পার্ক প্লাজার এক্সিকিউটিভ শেফ জয়ন্ত ব্যানার্জী, কলকাতার পার্ক প্রাইমের এক্সিকিউটিভ শেফ ভাস্কর ভট্টাচার্য, আইটিসি সোনার–এর লার্নিং ও ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার শিব কুমার মহাপাত্র, ললিত গ্রেট ইস্টার্নের ট্রেইনিং ম্যানেজার সুদীপ্ত হালদার, এনআইপিএস হোটেল ম্যানেজমেন্টের ডিরেক্টর বিবেক পাঠক, ও এনআইপিএস হোটেল ম্যানেজমেন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর শেফ যোসেফ উত্তম গোমস।

এনআইপিএস হোটেল ম্যানেজমেন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর শেফ যোসেফ উত্তম গোমস জানান, এটা একটা কঠিন প্রতিযোগিতা হলেও ছাত্র–ছাত্রীদের কাছে একটা বিরাট ক্ষেত্র যার মধ্য দিয়ে তার শিখতে পারবে কি করে কম সময়, প্রচন্ড চাপে নিজের সবচেয়ে ভালোটা দেওয়া যায়।বলা যেতে পারে কঠিন বাস্তবকে চেনা ও তার মুখোমুখি হওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ এটি।

মন্ত্রগুপ্তির শপথে মেয়র পারিষদের বিস্ময় প্রকাশ

বরুণ মণ্ডল

'নিজের লোক' সহ 'পছন্দের প্রার্থী'দের সুরক্ষিত স্থান করে দিতে কলকাতা পুরসভার তৃণমূল পরিচালিত তৃতীয় পুরবোর্ডে মেয়র পারিষদের সংখ্যা বাড়তে চলেছে। আরও দু'জনের নাম ঘোষণা কেবল সময়ের অপেক্ষা। গত ৮ মে ঐতিহ্যবাহী প্রসিদ্ধ স্থান টাউন হলের সম্মুখভাগের সুসজ্জিত সিঁড়িতে (বিধানসভা ভবনের সামনে) দ্বিতীয়বারের জন্য কলকাতার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় ও কলকাতা পুর নিগমের এতোকালের ইতিহাসে প্রথম পুর অধ্যক্ষা হিসাবে কালীঘাটের মালা রায়ের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর কেন্দ্রীয় পৌরভবনের 'কাউন্সিল চেম্বারে' কলকাতার উপ মহানাগরিক ও মেয়র পারিষদের 'মন্ত্রগুপ্তির শপথ' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়।

এই অনুষ্ঠানে প্রথম উপ–মহানাগরিক হুগলি জেলার খানাকুলের বিধায়ক পার্কসার্কাসের ইকবাল আহমেদ (৬৪)কে মন্ত্রগুপ্তির শপথ পাঠ করান কলকাতার মহানাগরিক। এরপরে মেয়র পারিষদের মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণের শুরুতেই মহানাগরিক নারকেলডাঙার স্বপন সমাদ্দার (বিশু)কে (৫৮) ডেকে নেন। আর এর ফলে অনেকেই অদ্ভুত রকমের বিস্ময় প্রকাশ করেন। কারণ একদম প্রথম সারিতে তখন আসন অলঙ্কৃত করে আছেন অতীন ঘোষ (১১), দেবাশিস কুমার (৮৫) দেবব্রত মজুমদার (৯৬) দের মতো স্বনামধন্য 'হেভিওয়েট'রা। তৃণমূলের একাংশের অবশ্য দাবি, ওই সমস্ত তথাকথিত 'হেভিওয়েট'দের গুরুত্ব 'হ্রাস' করতে মহানাগরিক 'ইচ্ছাকৃতভাবেই' মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণে 'হেভিওয়েট'দের দেরিতে ডেকেছেন। কারণ, গত তৃণমূল পুরবোর্ডে শোভনের সঙ্গে সঙ্গে অতীন, দেবব্রত ও দেবাশিসবাবুর নাম উচ্চারিত হয়েছিল। মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণে দু'য়ে আসেন উত্তর কলকাতার একমাত্র মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। তিনে আসেন পার্কসার্কাসের মনজর ইকবাল (৬১)। তিনি উর্দুতে শপথ নেন। চারে আসেন গড়িয়াহাটের (মনোহরপুকুর রোড) দেবাশিস কুমার। পাঁচে আসেন বেহালার তারক সিংহ (১১৮)। ছ'য়ে আসেন বিজয়গড়ের দেবব্রত মজুমদার। সাতে আসেন এ পর্যন্ত ১২ জন মেয়র পারিষদের একমাত্র মহিলা সদস্যা তালতলার ইন্দ্রাণী সাহা বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৩)। আটে আসেন বন্দর এলাকার সামসুজ্জামান আনসারি (১৩৬)। আনসারিজী ইংরেজিতে শপথ নেন। ন'য়ে আসেন যোধপুর পার্কের রতন দে (৯৩)। দশে আসেন বেহালার অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় (১৩০)। এগারোতে আসেন পার্ক সার্কাসের আমিরুদ্দিন ওরফে ববি (৫৪)। ইনি ইংরেজিতে শপথ নেন আর বারোতে আসেন বন্দর এলাকার রাম প্যায়ারে রাম (৭৯)। ইনি বাংলাতে শপথ গ্রহণ করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক হচ্ছেন ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি ১৩ নম্বর বরো কমিটির প্রাক্তন অধ্যক্ষা রত্না শূর।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১৬ মে – ২২ মে, ২০১৫

সরকারি বিজ্ঞাপনে প্রধানমন্ত্রীর ছবিও কী জরুরি?

সংবাদপত্রে সরকারি বিজ্ঞাপন নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট সম্প্রতি যে রায় দিয়েছেন তাতে রাজনৈতিক দলের নেতারা অখুশি হলেও সাধারণ মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন। সাধারণ মানুষের করের অর্থে যখন সরকারি বিজ্ঞাপনগুলি স্রেফ রাজনৈতিক স্বার্থে দিনের পর দিন ব্যবহার হয় তখন সরকারি বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যহত হয়।

মাধব মেনন কমিটি সুপারিশ করেছিল ভোটের আগে সরকারি বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন রাজ্যের জনপ্রতিনিধিরা তাদের ছবি ছাপিয়ে সরকারি কাজের কৃতিত্ব নিজের ব্যক্তিগত সাফল্য হিসাবে তুলে ধরে ভোটারদের প্রভাবিত করে থাকে এবং সেক্ষেত্রে মন্ত্রীদের ছবি ছাপা নিষিদ্ধ হোক সরকারি বিজ্ঞাপনে। সুপ্রিম কোর্ট অতটা কঠোর না হলেও তারা নির্দেশ দিয়েছে কোনও সরকারি বিজ্ঞাপনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির ছবি ছাড়া অন্য কোনও জনপ্রতিনিধি, মুখ্যমন্ত্রী এমনকি রাজ্যপালের ছবিও ছাপা যাবে না। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান বিচারপতির ছবি ছাপতে গেলে তাঁদের অনুমতির প্রয়োজন আছে।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায় সমস্ত রাজ্যের শাসকদলকে চিন্তিত করবে সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক ময়দানে প্রায় সমস্ত দলটাই কমবেশি তাঁদের নেতানেত্রীদের ছবিসহ ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় দক্ষিণ ভারতে একসময় একচেটিয়া এই দৃশ্য চোখে পড়ত। দক্ষিণ ভারতের বহু বিখ্যাত নেতা নেত্রী উঠে এসেছেন রূপালি পর্দার হাত ধরে। সিনেমার সেই ভাবমূর্তি ধরে রাখতে তাদের ভক্তকুল বিশাল বিশাল কাট আউটে ভরিয়ে দিত রাস্তাঘাট। দক্ষিণ ভারতের এই ব্যক্তিপূজোর ছোঁয়া দ্রুত ছড়িয়ে যায় অসম, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। ভোটে জেতার পর যাঁরাই জয়ী হয়ে শাসক হন তাঁরা পুরনো অভ্যাস বসেই নিজের ছবি সরকারি বিজ্ঞাপনে ইচ্ছামত ব্যবহার করেন। এমন কী সদ্য ক্ষমতায় এসেও তারা পূর্ববর্তী শাসক সরকারের প্রকল্পকে নিজেদের বলে চালান। নেতানেত্রীদের সচিত্র বিজ্ঞাপন ভোটারদের অধিকাংশেই প্রভাবিত করে এটা রাজনীতিকরা খুব ভাল বোঝেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ছবি যেমন সরকারি বিজ্ঞাপনে যাবে না তেমনি দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবিও কী খুব জরুরি? কারণ প্রধানমন্ত্রীও কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনের সময় ভোট প্রচারে প্রধানমন্ত্রী যান সে ক্ষেত্রেও একই ভাবে ভোটারদের প্রভাবিত হবার সুযোগ থেকে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধান বিচারপতি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন না সেক্ষেত্রে তাদের ছবি সরকারি বিজ্ঞাপনে গেলে নির্বাচনমুখী প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা কম।

অমৃত কথা

৫৫৬ কোনও যুবক সাধক একজনকার সম্বন্ধে যা ভেবেছিল ঠিক তাই ঘটেছিল। যুবক মনে করলে, তবে তো আমার সিদ্ধি লাভ হচ্ছে এবং সে আনন্দে তাড়াতাড়ি পরমহংসদেবের কাছে এসে সেই ঘটনাটি বললে। পরমহংসদেব তার কথাটি শুনে বললেন, 'দূরশালা! ওদিকে খেয়াল করিসনি।

৫৫৭ শুঁড়ির দোকানে অনেক মদ থাকে, কিন্তু মানুষ কেউ এক পো, কেউ আধ সের মদ খেয়ে মেতে যায়। অখণ্ড সচ্চিদানন্দও অপার আনন্দের সাগর, কিন্তু ভক্তেরা অল্পাধিক পরিমাণে তাঁকে উপভোগ করে তৃপ্ত হন।

৫৫৮ চিনির পর্বতের মতো অখণ্ড সচ্চিদানন্দ নিত্য বিরাজমান। সাধু ভক্তরূপ পিপীলিকাশ্রেণি যথাশক্তি এক এক দানা নিয়ে ভরপুর হয়ে যাচ্ছেন। শুকদেব, নারদাদি মহাশক্তিমানেরা তা থেকে ডেও পিঁপড়ের মতো এক একটি বড় চিনির দানা নিয়েই ভরপুর হয়েছেন। অপর সাধারণে এক একটি ছোট দানা নিয়েই ভরপুর হয়েছেন। কিন্তু সেই অসীম অনন্ত অচলের সম্পূর্ণ ইয়ত্তা করতে পারেন, কে এমন শক্তিমান আছেন?

৫৫৯ যে সাধু ওষুধ দেয় ও নেশা করে সে ঠিক সাধু নয়, তাঁর সঙ্গ করা উচিত নয়।

৫৬০ নারকেল গাছের বাকলা খসে যায়, কিন্তু দাগ থাকে। শরীর থাকতে আমিত্বও সেই রকম একেবারে যায় না, একটু না একটু দাগ থাকে। কিন্তু এই যৎসামান্য আমিত্বও জীবন্মুক্ত পুরুষকে পুনরায় সংসারে আবদ্ধ করতে পারে না।

৫৬১ দুর্লভ মানবজন্ম পেয়ে যে ঈশ্বরকে লাভ করার চেষ্টা না করে তার জন্মই বৃথা।

৫৬২ যাঁকে দশজনে জানে, মানে ও গণে, তাঁর ভেতরে ভগবানের বিভূতি অধিক পরিমাণে আছে বুঝতে হবে।

৫৬৩ যেখানে দশজন গড় করে সেখানে তোমরাও গড় কোরো, তাতে ভালোই হবে।

৫৬৪ এ কলিকালে তিন দিনে মানুষ সিদ্ধ হবে। যে দিনরাত তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদে, সে সিদ্ধ হয়।

ফেসবুক বার্তা

বাংলা সাহিত্য তথা চলচ্চিত্র জগৎকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলায় গোয়েন্দা চরিত্র ফেলু মিত্তির ওরফে প্রদোষ চন্দ্র মিটার–এর অবদান কোনও অংশে কম নয়। জেমস বন্ডের মতো ফেলুদার চরিত্রে এবং কাহিনী নিয়ে আজও নিত্য নতুন ছবি নির্মিত হচ্ছে। তবে শাশ্বত এই টিম ফেলুদার জুড়ি মেলা ভার।

নাগভূমে 'চিমার' নাগ লোক ধর্ম

পর্ব ২৩

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক রাজনীতি সমাজ চর্চার মার্কিন বিজ্ঞানী স্যামুয়েল হানটিংস্টন তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থ The Clash of Civilization নামক গ্রন্থে লিখেছেন ৯০–এর দশক থেকে দেশে দেশে বা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী সংকটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা অর্থনীতি রাজনীতির সংকট বা সংঘাত নয়, এই সংঘাত সংঘর্ষ ধর্ম–সংস্কৃতির। গোষ্ঠী কৌম জীবন থেকে রাষ্ট্র–সর্বত্র ধর্ম সংস্কৃতিতে রক্ষা করার অস্ত্র রেওনেট ল্যান্ড মাইন। ভারতে আদিবাসী জীবনে ধর্ম সংকট তীব্র। স্বাধীনতার পর থেকে রাজ্যে রাজ্যে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দু বর্ণ জাতপাত তাদের ত্যাজ্য করে রেখেছিল। অথবা আদিবাসী জনগোষ্ঠী চেয়েছিল নিজেদের সভ্য সমাজ বর্ণ সংস্কৃতি থেকে দূরে থেকে নিজেদের লোকধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে। ইংরেজ শাসনের সময় খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তকরণের আগ্রাসনের কৌশলে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয়নি। তাদের লোকধর্ম বজায় রেখে অবিচল থাকা। কোল, সাঁওতাল, ভীল, ওঁরাও জনগোষ্ঠী প্রতিবাদে বিদ্রোহী অবশ্যই হয়েছিল। ইংরেজ শাসকরা ধর্মান্তকরণের স্বার্থে ১৯২০ Criminal Tribals Act প্রণয়ন করে উপজাতি গ্রামগুলিতে অপরাধ দমনের নামে অত্যাচার ধর্ষণ, খুন, লুঠপাট পুলিশ প্রশাসনের উর্দি বুট পরে শুরু করে। এই অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তকরণের আশ্রয় নেয়। শুধুমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশে নয়, তামিলনাড়ু, কেরল সহ দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে একদিকে বর্ণ হিন্দুদের বৈষম্য অন্যদিকে ইংরেজি পুলিশ প্রশাসনে অত্যাচারের সাঁড়াশি আক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উপজাতি এই দলিত বর্গের লোকেরা ধর্মান্তরিত হয়। বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল ময়ূরভঞ্জ দলিত বর্গের লোকেরা ধর্মান্তরিত হয়। বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল ময়ূরভঞ্জ পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়খণ্ড, পুরুলিয়া, এবং ওড়িশা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তকরণ করে পুলিশের অত্যাচারের ভয় অথবা প্রলোভনের ধারা বিহারে ছোটনাগপুরে উপজাতিরা হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার ১৮৫০ সালে বেলজিয়ান জেসুইটদের দ্বারা ধর্মান্তরিত হয়ে নিজেদের জমি রক্ষা করে।

দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বৃটিশ খ্রিস্টান মিশনারী বিশেষ করে ক্যাথলিক চার্চের যাজক ও বিশপরা ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়াকে এক প্রকার গায়ের জোরে করে। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের পর লর্ড পামারস্টোন ক্যান্টারবেরী আর্চ বিশপকে অনুরোধ করেছিল ভারতের নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তকরণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বকে শক্তিশালী করার। নানা উপজাতি জনগোষ্ঠী খ্রিস্টান মিশনারীদের এই ধর্মান্তকরণের ফলে তাদের উপজাতি সংস্কৃতিকে নষ্ট করার বিরুদ্ধে প্রথমে বিদ্রোহী হলেও ১৯১১–১২ সালে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে দুর্ভিক্ষের কারণে স্থানীয় উপজাতিরা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে ধর্মান্তরিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উপজাতিদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। হিন্দু সমাজে তারা যে হীনমন্যতায় বসবাস করত তা থেকে তাদের মুক্তি হয়। বৃটিশ প্রশাসকেরা উপলব্ধি করেছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতি জনগোষ্ঠী আনুগত্য লাভ করতে পারলে তাদের বিদ্রোহ অভ্যুত্থান থেকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শান্তি নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব হবে। ১৮৭১ ই ডবলু ক্লার্ক আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশন নানা উপজাতিদের ধর্মান্তকরণ শুরু করে। নাগাল্যান্ডে ৯২% ক্রিশ্চান। হিন্দু ও মুসলমানরা সংখ্যালঘু। প্রতিটি গ্রামে একটি করে চার্চ রয়েছে। মিজো নাগারা যোদ্ধা উপজাতি। পার্বত্য উপত্যকায় বসবাস করার ফলে তাদের বিপদে ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা রয়েছে। ১৮৪০ সালে এক ব্রিটিশ কর্মচারি নাগভূমের পার্বত্য অঞ্চলে প্রশাসনে যুক্ত থাকাকালীন তাঁর অভিজ্ঞতা লিখেছেন, নাগারা তাদের মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করে আপন শক্তি সাহসের দ্বারা শত্রুকে আক্রমণ করে। ১৮১৩ চার্টার আইনে নাগভূমিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মিশনারীদের ধর্মীয় প্রচারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উত্তরপূর্বকালে নাগাল্যান্ড এবং মিজোরাম এই দুই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি উপজাতির বসবাস। সংবিধান রচনাকাররা কাশ্মীর রক্ষার জন্য এতটাই উদগ্রীব ছিল যে মহারাজ হরি সিংহের হেঁয়ালি রাজনীতি ও শেখ আব্দুল্লার তোষণের জন্য ৩৭০ ধারায় বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়। অথচ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের নাগা–মিজো সমস্যা জাতীয় স্বার্থ সার্বভৌমত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। তা তারা কখনওই ভাবেনি। এই সুযোগকে কাজে লাগায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের খ্রিস্টান মিশনারীরা। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সারা দেশে প্রায় ৮ শতাংশ খ্রিস্টান বসবাস করে। অর্থেক ৪% বসবাস

করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যে। নাগাল্যান্ড–মিজোরাম–অরুণাচল প্রদেশে সংবিধানে ব্যক্তির স্বাধীনভাবে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের যে অধিকার যে দেওয়া হয়েছে, এই রাজ্যগুলিতে নিয়ন্ত্রিত। সরকারের যুক্তি (অজুহাত) হল যে আদিবাসী জীবন ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তার স্বার্থে নাগরিকদের অনুমতি পত্র নিয়ে এই রাজ্যগুলিতে বেড়াতে যেতে হবে।

চিন ও পূর্ব পাকিস্তান

উত্তর হিমালয় এবং বার্মা চিন ও পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অতীতে অসমের অংশ ছিল নাগা পর্বত। এই পার্বত্য উপত্যকায় ১০০–র বেশি উপজাতি রয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে অঙ্গামি নাগারা সংখ্যা গরিষ্ঠ। স্বাধীনতার আগে ইন্দো–বর্মা সীমান্ত এলাকায় নাগারা বসবাস করত। আসামের হিন্দু গ্রামের পরিবার থেকে চালের বিনিময় লবন সংগ্রহ করত। ভাতের গ্রাসাচ্ছাদনে নুন তাদের এলাকায় পাওয়া যেত না। মুক্তি সংগ্রামের সময় জাতীয় কংগ্রেস এবং গান্ধিজীর অহিংসা অসহযোগ সত্যাগ্রহ এমনকি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সাথে এই জনজাতিদের যুক্ত করার তাগিদা গান্ধিজী থেকে কোনও জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ প্রয়োজন বোধ করেনি। ব্রিটিশদের সাথে তাদের যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল তাঁর কারণ হতে পারে হিমালয় পার্বত্য এলাকায় জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণার উদাসীনতা, উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ প্রশাসকদের সাথে তাদের সংঘর্ষ ছিল নিয়মিত ঘটনা। কিন্তু বিংশ শতকে শুরুতে খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের বোঝাল, হিংসা–হত্যার পথ ছেড়ে সরকারের সাথে আপোশ করে চললে আধুনিক সভ্য সমাজের অত্যাচার দুর্নীতি থেকে সরকার পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সন্তান (নাগা)দের স্বাধিকার রক্ষা করবে। সাম্রাজ্যবাদের কৌশলগত ভুলভুলাইয়ায় নাগারা হারিয়ে গেল মুক্তি সংগ্রাম থেকে।

১৯৪৭ সালে ৩০শে জুলাই গণপরিষদের সভায় উপজাতি সদস্য জয়পাল সিং উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে নাগা পার্বত্য এলাকায় নাগা শিক্ষিত খ্রিস্টানরা স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে। নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল গড়ে তুলেছে। নাগারা চাইছে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে। নাগা প্রতিনিধ দল যখন দিল্লিতে এসে গান্ধিজী এবং জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে দেখা করল তখন তারা কাউন্সিল গড়ে তোলা বিষয়টি Blunt fact বলে উল্লেখ করে। নাগা পার্বত্য অঞ্চল ভারতে অংশ হিসাবে মেনে নেয়। গান্ধি ও নেহেরু আশ্বস্ত হলেও নাগা সমস্যার বিপদ বা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে আশ্বাসের কারণ হয় নি।

গণপরিষদ সদস্য জয়পাল সিং–এর আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় নি। দেশ বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫০–এর দশকে। যার নেতৃত্বে ছিলেন অঙ্গামি ঝাপু পিজো। তার একটাই দাবি উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ভারত থেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম নাগাল্যান্ড। অথচ এই পিজোর ১৯৪৭–এর জুলাই মাসে গান্ধিজীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন 'নাগাভূমি' ভারতের অঙ্গ। পরবর্তীকালে তিনি দাবি করলেন ৯৯.৯৯% নাগা জনজাতি স্বতন্ত্র স্বাধীন নাগাল্যান্ডের পক্ষে। ১৯৫১ সালে ডিসেম্বর মাসে ২৩–২৪ অসমের তেজপুরে লোকসভা নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা দিতে এলেন জওহরলাল নেহেরু। পিজো নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি করে নাগাল্যান্ডের জন্য স্বাধীন ভূ–রাজনৈতিক অঞ্চল। নেহেরু প্রত্যুত্তরে বললেন, এই দাবি অলীক কল্পনা মাত্র এবং ইতিহাসের চাকাকে পিছনের দিকে ঘোরানোর চেষ্টা। তবে নাগাদের প্রশাসনিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকারকে মেনে নিতে তিনি রাজি আছেন। ১৯৫৩ থেকে ২০০৫ দীর্ঘ ৫৫ বছর ধরে নাগাভূমি গণহত্যার রক্তে লাল হয়েছে। কাশ্মীর সমস্যার মতো নানা সমস্যার ক্ষেত্রে পাকিস্তান চীনের মদত রয়েছে। চীনের অভিসন্ধি নাগাল্যান্ডকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে এই পার্বত্য অঞ্চলের ওপর নিজের খবরদারি করতে। নাগা অঞ্চল দিয়ে অরুণাচলের মতো উত্তরপূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের ভূখণ্ড তাদের এশিয়াতে চলে আসবে।

১৯৫২ সালে দেশের প্রথম নির্বাচন নাগারা বয়কট করেছিল। এই বছর ফেব্রুয়ারী মাসে এক সাংবাদিক বৈঠকে ফিজো বলেছিলেন, ''২ লক্ষ নাগা স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি করে। বাকি ২ লক্ষ নাগা কোন রাষ্ট্রের নাগরিক নয়। ৪ লক্ষ নাগা কখনোই ভারতের নয় বার্মার নাগরিক।'' ১৯৫৩ নাগাল্যান্ড ন্যাশনাল কাউন্সিল (এনএনসি) গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। যার ফলে আসামের এক্তিয়ারভুক্ত এই অঞ্চলটিতে গৃহযুদ্ধে এমএনসির আক্রমণ ও অসম রাইফেলসের সংঘর্ষে পঞ্চাশের দশকে কয়েক হাজার লোক মারা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৫৫–১৯৭৫ দীর্ঘ ২০ বছরে ৩৪ হাজার আদিবাসী এবং সেনা জওয়ানরা গৃহযুদ্ধের সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। ১৯৫৫ সালে এম এন সির প্রধান ফিজোর সাথে জঙ্গি সংগঠনের সেক্রেটারি টি সাকেরির সাথে বিরোধ বাঁধে। সাকেরীর বক্তব্য ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন নাগাল্যান্ড প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। ভারত সরকারের সাথে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করা। ফিজো এই বক্তব্যে ক্ষিপ্ত হয়। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে তাঁর নির্দেশে নাগা গেরিলা বাহিনী।

ফিজো নাগা আন্দোলনের একছত্র নেতা হিসাবে দাবি করলেও শিক্ষিত নাগারা তাঁর জঙ্গি ভারত বিরোধী নাশকতামূক কার্যকলাপকে সমর্থন করেননি। শেষ ব্রিটিশ ডেপুটি কমিশনার চার্লস পাওয়েলকে এক চিঠিতে ১৯৫৬ সালের জুন মাসে লিখেছেন, 'প্রতি রাতে পার্বত্য এলাকার গ্রামের পর গ্রাম বিদ্রোহী অথবা সেনাবাহিনীর অত্যাচারে আগুন জ্বলছে। এই নাগা ডাক্তার আর একটি চিঠিতে লিখেছেন, ''৫ শতাংশ নাগা ফিজোকে সমর্থন করে। ১ শতাংশ অসম থেকে বেরিয়ে এসে ভারত সরকারের অধিকৃত রাজ্য চায়। ৯৮.৫% উপজাতি নাগা ভূমির একলা চলার দাবি রাখে।'' ১৯৫৬ সালের ২২ মার্চ এনএনসি ফেডারেল গভর্নমেন্ট অব নাগাল্যান্ড (নাগাল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গড়ে তোলে এবং কোহিমায় স্বাধীন পতাকা ওড়ায়। নাগাল্যান্ডের এই সরকারকে সমর্থন করেছিল বার্মার কমিউনিস্ট পার্টি এবং গোপনে মাও সে তুঙ–এর কমিউনিস্ট পার্টি এই সরকারের প্রতি মদত দেয়। ভারতীয় বায়ু সেনারা অবশ্যই দ্রুত রণকৌশলতার দ্বারা এই সরকারকে উৎখাত করে। ১৯৬২ সালে ভারত সরকার নাগাল্যান্ড সিকুইরিটি এ্যাক্ট প্রণয়ন করে। ১৯৬৩ সালের ১লা ডিসেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন নাগাল্যান্ড রাজ্যের উদ্বোধন করেন কোহিমায়। আসাম–অরুণাচল প্রদেশ–মণিপুরের পার্বত্য এলাকা নিয়ে নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠন এই তিন রাজ্য তীব্র বিরোধিতা করে। পি শিলি আও প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন। স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন হলেও নাগাল্যান্ড সমস্যার সমাধান হয় নি। শুরু হল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব।

ভারত সরকার ফিজোর ওপর চাপ সৃষ্টি করে ১৯৭৫–এর ১১ই নভেম্বর শিলং চুক্তি সাক্ষর করলেন। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধানের প্রতি মান্যতা দিয়ে বিদ্রোহীরা আস্থ সমর্থন করবে এই চুক্তির ফলে পরবর্তী তিন বছর নাগা পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরে এসেছিল। কিন্তু ১৯৮০ সাল থেকে নতুন উৎপাত শুরু করে ফিজোর একটা অনুচর থিয়াংগেলং মুইবা ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড গঠন করে। এই জঙ্গি সংগঠনটির লক্ষ্য মাও আদর্শে নাগা বিপ্লবের মধ্য খ্রিস্টানদের জন্য নাগাল্যান্ড রাষ্ট্র গঠন করা। ২০০০–২০১৪ এই সময়ে ২০০৫ বেশি নাগা উগ্রপন্থী গোষ্ঠী সংঘর্ষে রাজ্যের বাসিন্দারা মারা গিয়েছে। ১৯৯৭, ২০০৮ দুই পর্বে এন এস সি এমের দুটি গোষ্ঠীর সাথে শান্তি চুক্তির ধারা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে ভারতীয় সংবিধানিক শর্তে তাদের স্বাধিকার দেবার কথা বলা হয়। কিন্তু নাগাল্যান্ডের ভারত বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বন্ধ করা যায়নি। প্রধান কারণ, খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রত্যক্ষ মদত। কাশ্মীরের ক্ষেত্রে যেমন চীন পাকিস্তানের মদত নাগাল্যান্ডের ক্ষেত্রে দেশ বিরোধী চিনের ইন্ধন রয়েছে। এন এস সি এমের বিবাদমান দুটি যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছে তাঁর পেছনে চার্চের মদত রয়েছে। ২০০৮ সালে ১২ই মে Sentihel পত্রিকায় আসামের প্রাক্তন মুখ্য সচিব জেপি রাজখোয়া লিখেছেন ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল সব চার্চের সাথে সন্ত্রাসবাদীর যোগাযোগ রয়েছে।

একদা প্রভু যীশুর ক্ষমার বাণী শান্তির পথে নাগাল্যান্ডের আদিম জাতি ধর্মান্তকরণের মধ্য দিয়ে সভ্য সমাজে ফিরে এসেছে। অন্তত খ্রিস্টানরা যাকে বিশপ দাবি করে। ২০১৫ সালে যীশুর নামে সন্ত্রাস করছে। দাবি খ্রিস্টান রাষ্ট্র নাগাল্যান্ড। ২০০৬ সালে জন্মাষ্টমীর দিন ইসকন মন্দিরে গ্রেনেড ছুঁড়ে ৪ জন কৃষ্ণ ভক্তকে হত্যা করে, ২০ জন আহত হয়। উপজাতিরা যদি নিজেদের ধর্ম রক্ষা করতে চায় তাহলে তাঁর ওপর নেমে আসে পাশবিক অত্যাচার, দুর্গাপুজো সরস্বতী পুজো মিশনারীদের ফতোয়ায় নিষিদ্ধ। ভারতের অন্যরাজ্যের নাগরিক খ্রিস্টান নাগাদের কাছে 'চিমার' বিদেশি। বিপন্ন নাগভূমের ভূমিপুত্রের আদি ধর্ম লোকাচার সংস্কৃতি।

তবে কি সন্ত্রাস মাপার প্যারামিটার চাই?

নির্মল গোস্বামী

প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী কিশোর কুমারের একটি জনপ্রিয় গান আছে—''মানব জনম দিয়ে বিধি পাঠাওনা পৃথিবীতে/যত দুঃখ পেলাম আমি মাপার মত নেইকো ফিতে।'' পৃথিবীতে দুঃখ আছে, কিন্তু দুঃখ মাপবার মতো কোনও নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই—এই একটা মানে হতে পারে। আবার দুঃখ আছে এবং দুঃখ মাপার মানদণ্ড আছে—কিন্তু দুঃখের পরিমাণ এতো বিশাল যে প্রচলিত মানদণ্ডে তা মাপা যায় না। মানদণ্ডটাকে বাড়াতে হবে এই একটা অর্থ হতে পারে। কিন্তু গীতিকার কোন অর্থকে গানের মধ্যে বোঝাতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার নয়। কিন্তু এই তর্কটা আমার বিষয় নয়, বিষয়টা হল যে দুঃখের পরিমাণটা কত তার পরিমাপটা করা যায় না বলেই আক্ষেপ করেছেন গীতিকার।

এই আক্ষেপ আমাদেরও মানে আমজনতার। কারণ বর্তমানে অনেক জিনিসের আগে হত না এখন মান নির্ধারণ হচ্ছে। যেমন ধরা যেতে পারে শব্দ দূষণ। ১০–১৫ বছর আগে কেউই ভাবতে পারত না যে শব্দে আবার দূষণ ছড়ায়। সুস্থ মানুষের কর্ণকুহরে কত ডেসিমেল শব্দ প্রবেশ করা উচিত, তা আমরা ইদানিং জেনে মহা আহ্লাদিত হয়েছি। কারণ কত ডেসিমেলের বাজি ফাটাল তা নিরূপণ করে যে বাজি ফাটাচ্ছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে আইনি সংস্থা। তেমনই বায়ু দূষণ বায়ুতে কার্বন মনোক্সাইড কতটা থাকলে বা ধূলি কণার পরিমাণ কতটা থাকলে আমাদের প্রশ্বাসে সহনীয় হয় তা আমরা জেনে আপ্লুত কারণ সুস্বাস্থ্য কে না চায়? তেমনি আবার জল দূষণ আছে। তাও মাপবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই জোরের কথা পরিবেশবিদরা বলে দিচ্ছেন ''রাম তেরি গঙ্গা মইলি হো গয়ি'' এই গঙ্গার জল শরীরে ছোঁয়াবার যোগ্য আর নেই। ''গঙ্গা তেরি পানি অমৃত'' এ গানের আর যৌক্তিকতা নেই। এই সব হয়েছে আজ জনতার স্বার্থের কথা ভেবে। তেমনি আরও অনেক কিছু হওয়ার বাকি আছে। যেমন ভালোবাসার পরিমাণ মাপার পদ্ধতি যদি আবিষ্কৃত হত, তাহলে অনেক হত্যা, অনেক স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ আটকানো যেতো। বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দীর্ঘ দিন ধরে বয়ে বেড়াতে হত না। কার ভালোবাসা কতটা সেটা ল্যাবের রিপোর্ট দেখে জজ সাহেব যার যার ভালোবাসা বেশি তার পক্ষে রায় দিতে পারতেন সহজে। আহাঃ এমন যদি হত যে নেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে যা ভাষণে বলছেন তা শব্দ দূষণ মাপার মতো কোনও যন্ত্র দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যদি মাপবার সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করা যেতো তাহলে জনগণের প্রকৃত বন্ধু কোন দল বা কোন নেতা তা কত সহজে জানা যেতো। যে কোনও জনসভায় বিরোধী দলের কর্মীরা গিয়ে যন্ত্র নিয়ে বলে দিতে পারতেন অমুক নেতা কত পারসেন্ট মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এবং তা প্রমাণিত সত্য হত। যদি এমন দিন আসে তাহলে বুঝতে হবে সেদিন সত্যই আছে দিন এসেছে।

এই যে সদ্য কলকাতা করপোরেশনের ভোট পর্ব মিটল। কত না হাঙ্গামা। ভোটারনের মেশিন উঠেছে। আচ্ছা যদি এমন মেশিন ওঠে যে, যত ভোট পড়ছে তার কত শতাংশ সঠিক ভোট আর কত শতাংশ ফলস ভোট তার যদি একটা হিসাব বের হত। যদি কত শতাংশ ভোট পড়েছে মুক্ত মনে আর কত শতাংশ ভোট পড়েছে ম্যানুপুলেটের জন্য তার মধ্যে (তার মধ্যে ভয় ভীতি প্রদর্শন টাকার বিনিময় বা অন্য কিছু প্রতিশ্রুতিতে) তার যদি একটা হিসাব বের হত তাহলে আর এত সমালোচনার প্রয়োজন হত না। নির্বাচন কমিশনের এতো বিবৃতি। মুখ্যমন্ত্রীর মতে এমন শান্তিপূর্ণ ভোট ভূ–ভারতে আর কোনও দিন কোথাও হয় নি। বিরোধীদের ''সর্বাত্মক সন্ত্রাসের পরিবেশে ভোট লুঠ হয়েছে মাত্র।'' এই সব কথা শুনতে শুনতে বাঙালির সান্ধ্যকালীন বিনোদনে বাধা পড়ত না। এক কথায় ভোট লুঠের কোনও কার্যকারিতাই থাকত না। বাইক বাহিনীর প্রয়োজন পড়ত না। কারণ ভয়ে ভোট দিলে তা মেশিনে ধরা পড়বে। প্রার্থীদের ভোটারদের চমকাতে ধমকাতে হত না। প্রিসাইডিং অফিসারদের ডাইরি ঠিক মতো লেখা হত। নির্বাচন কমিশনারকে সকালে সন্ধ্যায় ভোটের শতাংশের হিসাব পালটাতে হত না। শাসক দলের দলদাস হয়ে পুলিশকে আর কাজ করতে হত না। কারণ 'ওপেন' কিংবা 'চাপা' কোন রকমের সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তার প্রয়োজন পড়ত না।

এতোক্ষণ যে বক্ বক্ করলাম জানি এমনটা হবার নয়। এটা অলীক কল্পনা মাত্র। ফলে আমাদের ভোট সন্ত্রাসের আবহে ভোট করতে হবে না হলে গণতন্ত্র বাঁচে না যে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই যে 'সন্ত্রাস হয়েছে' বিরোধীরা বলতে পারছে এটাই গণতন্ত্র। সত্যই তো গণতন্ত্রকে বাঁচানোই আশু কর্তব্য সে সন্ত্রাস যুক্ত গণতন্ত্র হোক আর সন্ত্রাস বঙ্গে। যে সন্ত্রাসকে অস্বীকার করছে সে কিন্তু সন্ত্রাসকে অন্যায় মনে করে অস্বীকার করছে। আর যে বলছেন সন্ত্রাস মাত্রা ছাড়া হয়নি সে কিন্তু একটা সীমা পর্যন্ত সন্ত্রাসকে অন্যায় বলে মনে করছেই না। এখন প্রশ্ন হল সেই সীমা রেখাটা কে ঠিক করবে? কতটা সন্ত্রাস জনগণের মেনে নেওয়া উচিত? যারা বলছেন সন্ত্রাস মাত্রা ছাড়া হয়নি তাদেরই উচিত পুলিশ অথবা সাধারণ মানুষ বুলেট বিদ্ধ হলে বা কত বুথে ছাপ্পা ভোট হলে সহনীয় সন্ত্রাস বা মাত্রা ছাড়া সন্ত্রাস বলে গণ্য হবে তার একটি নির্দিষ্ট প্যারামিটারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যাতে গুণগত ও পরিমাণগত সন্ত্রাসের প্রতিশব্দ ''সুষ্ঠু ভাবে ধরা পড়বে। এই সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে সরকার ও বিরোধী পক্ষের চাপানউতোরের গুঁতোগুঁতিটা

মুক্ত গণতন্ত্র হোক। গণতন্ত্র বাঁচাতে গেলে ভোট উৎসব অপরিহার্য। আর স্বাধীনতার পর থেকে নাকি ছাপ্পা ছাড়া ভোট হয় নি। নির্বাচন কেউ যেমন সন্ত্রাস হয়েছে একথা মানতে চায় নি আবার কেউ কেউ বলছেন যে সন্ত্রাস একটু আধটু হলেও মাত্রা ছাড়া সন্ত্রাস হয়নি। ফলে ভোটের বাজারে সন্ত্রাসটাকে একটা লেজিটেমেন্ট সেফ দেবার চেষ্টা হচ্ছে বিশেষত এই পোড়া এই মাত্রাটা নির্ধারণ করে দেওয়া। তাহলে জনগণ এবং বিরোধী দল ও সমালোচকরা সহজেই বুঝতে পারবে যে এই পর্যন্ত সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস বলা যাবে না। এবং এর পর যদি হয় তবেই বলা যাবে সন্ত্রাস হয়েছে। যেমন কতগুলো বুথ দখল হলে। বা কত বুথের বিরোধী এজেন্টদের বের করে দিলে। বা কত জনের মাথা ফাটালে বা কত এলাকায় বোমাবাজি করলে, বা কতজন অন্তত থাকে। আর আমজনতাও ভোট সন্ত্রাসকে রাজনীতির উচ্ছ্বাস জনিত একটা বিকার বলে মেনে নিয়ে সান্ত্বনা পাবে। যেমন আর পাঁচটা ক্ষেত্রের অসংগতিকে মেনে নিতেই আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। তাই সন্ত্রাস মাপার একটা ফিতে বা যন্ত্র চাই যার দ্বারা সন্ত্রাসের মাত্রা কত, এটা জেনে উপনিষদের সেই বাণীকে স্মরণ করে সান্ত্বনা খুঁজবে ''নাম্ন্যঃপন্থা হয়ানায়ঃ''।

২০১৫–র কলকাতা পুর নির্বাচনের হাতবদল

ওয়ার্ড নম্বর	বিদায় (২০১০)	স্বাগত (২০১৫)
৮৭	তনিমা উপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস) (তনিমাদেবী গত পাঁচ বছর এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন। ওনার দাদা বর্তমানে রাজ্যের বরিষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। শ্রী মুখোপাধ্যায় ২০০০–২০১০ পর্যন্ত এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন)।	সুব্রত ঘোষ (ভারতীয় জনতা পার্টি, তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ৩২৮টি ভোট)।
৯৪	সেতাবুদ্দিন খোন্দকার (আরএসপি) (জনাব খোন্দকার ২০০৫–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন। যদিও এবার এই ওয়ার্ডের আরএসপি–র প্রার্থী ছিলেন তাবাসুম খাতুন)।	অর্চনা সেনগুপ্ত (তৃণমূল কংগ্রেস, আরএসপি–র প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ২১৩৯টি ভোট)।
৯৯	মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী পুর বোর্ডের শিক্ষা দফতরের মেয়র পারিষদ)। (যদিও এবার এই ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন রেখা দে। রেখাদেবী আবার গত পাঁচ বছর ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন)।	দেবাশিস মুখোপাধ্যায় (আরএসপি, তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান: ৫৩৫টি ভোট)।
১০১	গৌতম সরকার (সিপিআইএম) (শ্রী সরকার ২০১০–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন)।	বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত (তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান: ৩,৬৬৫টি ভোট)।
১০৩	সঞ্জয় দাস (তৃণমূল কংগ্রেস) (শ্রী দাস ২০১০–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন। যদিও এবার তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন সঞ্জয় প্রার্থী ছিলেন সঞ্জয়বাবুর স্ত্রী স্বপ্না দাস)	নন্দিতা রায় (সিপিআইএম, তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান মাত্র ২৯টি ভোট)।
১০৯	রুমকি দাস (সিপিআইএম) (১৯৮৫ থেকে ওয়ার্ডটি সিপিআইএমের দখলে ছিল)।	অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস, শ্রীমতি বন্দ্যোপাধ্যায় বেহালার ১১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, বর্তমানে ইনি রাজ্য নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের পরামর্শদাতা, প্রাক্তন বিমান সেবিকা ও 'চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটি'র সদস্যা। সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান: ২৭৩৯টি ভোট)।
১১০	চন্দনা ঘোষদস্তিদার (সিপিআইএম) (শ্রীমতি দস্তিদার ১৯৯৫–২০১৫ পর্যন্ত পুর প্রতিনিধি ছিলেন এবং ২০০৫–২০১০ বিকাশবাবুর নেতৃত্বে পুর বোর্ডের জঞ্জাল দফতরের মেয়র পারিষদ ছিলেন যদিও এবার এই ওয়ার্ডের প্রার্থী ছিলেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়)।	অরূপ চক্রবর্তী (তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান: ৫৬০টি ভোট)।
১১৪	অমল মিত্র (সিপিআইএম) (শ্রী মিত্র ১৯৮৫–২০১৫ টানা ৩০ বছর এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন, বিদায়ী পুর বোর্ডের বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক ছিলেন, যদিও এবার এই ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী ছিলেন হিমাংশু বিশ্বাস)।	বিশ্বজিৎ মন্ডল (তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ২১২৭টি ভোট)।
১২৭	শ্যামদাস (তৃণমূল কংগ্রেস) (অসুস্থ শ্রী রায় ২০০০–২০১৫ পর্যন্ত পুর প্রতিনিধি ছিলেন। বিদায়ী পুর বোর্ডের অলিখিত উপাধ্যক্ষ ছিলেন)।	নীহার ভক্ত (সিপিআইএম, তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ২৬৩১টি ভোট)।
১২৮	দোলা সরকার (তৃণমূল কংগ্রেস) (শ্রীমতি সরকার ২০১০–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন)।	রত্না রায় মজুমদার (সিপিআইএম, শ্রীমতি রায় মজুমদার ১৯৮৫–২০১০ টানা ২৫ বছর এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন এবং ১৪ নম্বর বরো কমিটি প্রাক্তন অধ্যক্ষ) (তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান: ৩১৫টি ভোট)।
১৩৫	রুবিনা নাজ (তৃণমূল কংগ্রেস) (রুবিনাজী হলেন মেয়র পারিষদ সামসুজ্জামান আনসারির বড় বউমা, গত পাঁচ বছর এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন, আর সামসুজ্জামানজী ১৯৯০–২০১০ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন)।	আখতারি নিজাম শাহজাদা (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ১৭১৩টি ভোট)
১৩৭	মহম্মদ আসিন আনসারি ওরফে ঝুন্নু (প্রথমে সিপিআইএমের প্রতিনিধি, নির্বাচনের কয়েক মাস আগে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ) (১৯৯৫–২০০০ ও ২০১০–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন। মহম্মদ আমিন হলেন মেয়র পারিষদ সামসুজ্জামানের আপন ভাই)।	রহমত আলম আনসারি (নির্দল প্রার্থী, সম্পর্কে সামসুজ্জামান ও মহম্মদ আমিনের ভাইপো, গত ৭ মে মহানাগরিকের মাধ্যমে তৃণমূলে যোগদান। তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান: ৩৩৪টি ভোট)।
১৩৯	মহম্মদ বদরুদ্দোজা মোল্লা (সিপিআইএম) (বদরুদ্দোজাজী ২০০৫–২০১৫ এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন। যদিও এবার এই ওয়ার্ডের সিপিএমের প্রার্থী ছিলেন সাকিল মইনুদ্দিন)।	আফতাবউদ্দিন আহমেদ (তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান মাত্র ১৫টি ভোট)।
১৪০	মমতাজ বেগম (তৃণমূল কংগ্রেস) (এবার তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন বিদায়ী পুর বোর্ডের ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি, সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পুরবোর্ডের শিক্ষা ও তথ্য দফতরের মেয়র পারিষদ মইনুল হক চৌধুরি)।	আবু মহম্মদ তারিক ওরফে তারিক আহমেদ মোল্লা (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান : ৭৮২টি ভোট)।

সামালি বড়পুকুরে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গরমকালে রক্তের চাহিদা তুঙ্গে ওঠে। ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিকে গ্রাস করে দীর্ঘ লাইন ও হতাশা। এই সমস্যাকে মাথায় রেখে আই এন টি টি ইউ সি অনুমোদিত টেগা ইন্ডাসট্রিস লিমিটেড কনট্র্যাক্ট লেবার ইউনিয়ন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে সামালি বড়পুকুর কারখানার গেটে আয়োজন করেছিল রক্তদান শিবির। গ্রীষ্মে রক্তদাতারা রক্ত দিতে উৎসাহ দেখান না। এই ধারণা পাল্টে গেল এই শিবিরে। প্রবীণ–নবীন, মহিলা–পুরুষ নির্বিশেষে শতাধিক সহৃদয় ব্যক্তি রক্ত দিলেন এই শিবিরে। অন্যতম উদ্যোক্তা প্রণব সাউ জানালেন রক্ত গ্রহণে এগিয়ে এসেছে ইএসআই হসপিটাল ও পিপলস্ ব্লাড ব্যাঙ্ক। উপস্থিত ছিলেন কার্যকরি সভাপতি শুভাশিষ চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক প্রশান্ত সেন ও হিলাল খান। উৎসাহ দিতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ প্রমুখ ব্যক্তিরা।

সিলিকনে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিনিধি : চ্যালার পর এবার গুরুর অফিসেও তল্লাশি চালালো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইয়ের বিভিন্ন টিম। প্রসঙ্গত সুদীপ্ত সেনের সারদার বিভিন্ন অফিস এবং সম্পত্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক দফা তোলপাড় চালিয়েছে এই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। এবার সুদীপ্তর গুরু বলে কথিত চিটফান্ড মাস্টার মাইন্ড শিবনারায়ণ দাসের একাধিক অফিস এবং সম্পত্তি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার সকাল থেকেই দফায় দফায় অভিযান চালায় সিবিআই। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গায় গড়ে ওঠা সিলিকন সাম্রাজ্যের দিকেই নজর ছিল এই তল্লাশিকারীদের। শিবনারায়ণের হাওড়া জগাছার বাড়িতেও হানা দেয় তারা।

বারুইপুর পুরসভার জয়ী ১৭ জন কাউন্সিলর শপথ নিলেন শুক্রবার। এরপর বোর্ড মিটিংয়ে চেয়ারম্যান পদে পুনর্নির্বাচিত করা হল শক্তি রায়চৌধুরীকে। –নিজস্ব চিত্র

ভোর–রাতের ট্রেন যেন অপরাধের স্বর্গরাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : না না কোনও দূরপাল্লার ট্রেন নয়। শহর ও শহরতলির লোকাল ট্রেনে কাকভোর বা গভীর রাতে সফর করেছেন কখনও? না করে থাকলে আপনি রেলযাত্রার এক অনন্য অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আর যদি এই সফর করে থাকেন তা হলে নিশ্চয়ই বুঝেছেন ইদানীং

কৃষ্ণনগর লোকালে বিস্ফোরণ নিয়ে যে সোরগাল চলছে তা চমক মাত্র। প্রতিদিন এমনও হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।

যাদের এই সফরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা সকলেই জানেন ভোর ও রাতের ট্রেন চলে যায় পাচারকারীদের দখলে। দাহ্য পদার্থ থেকে শুরু করে আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা, বিস্ফোরক মালপত্র, বেআইনি কাঠ থেকে শুরু করে গরু, ছাগল, ভেড়া পর্যন্ত পাচার হয় লোকাল ট্রেনের মাধ্যমে। এমন কি ট্রেনের মধ্যে প্রকাশ্যে মদ, গাঁজা, জুয়া চলে রমরমিয়ে। এই সময় কোনও নিরাপত্তা রক্ষীকে ত্রিসীমানাতেও দেখা যায় না। প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার জিনিস এভাবেই দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে পাচারকারীদের হাত ধরে।

রেল রক্ষায় রাজ্য সরকারের জেনারেল রেল পুলিশ (জিআরপি), কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) এবং টিকিট চেকাররাও রয়েছেন রেলের সম্পত্তি ও যাত্রীদের নিরাপত্তা দেখার দায়িত্বে। এদের ওপর নজরদারীর জন্য রয়েছে রেলের ভিজিলেন্স দফতর। প্রতিদিনের কাজ দেখবার দায়িত্ব নিয়ে মোটা মাইনে পাচ্ছেন জিএম, ডিআরএম প্রমুখরা। প্রত্যেককে নির্দিষ্ট পরিসরে কাজ করার ক্ষমতাও দেওয়া রয়েছে। কিন্তু ভারতীয় রেলে সবথেকে অবহেলিত যাত্রীরা এবং জামাই আদর পান অপরাধীরা। সাধারণ মানুষ থেকে রেলের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা প্রত্যেকেই জানেন এর পেছনে রয়েছে অর্থের হাতছানি।

আরপিএফ–এর এক প্রাক্তন অফিসার জানালেন, পুলিশ ইচ্ছা করলেই রেলের অপরাধীদের ধরা যায়। এর জন্য চাই সদিচ্ছা ও বড়কর্তাদের নজদারী। বেশ কিছুদিন আগেও লাগাম ভাঙা রেলের ছিন্তাই ছিল কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নিত্য দিনের ঘটনা। আজ কিছুটা হলেও তা সুরাহা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রেলের স্টেশন থেকে শুরু করে যাবতীয় পরিষেবা চলছে তাতে এই ধরনের খুনোখুনি, বিস্ফোরণ যে কোনও সময় ঘটতেই পারে। যার বলি হবেন আমার আপনার ঘরের ছেলেমেয়েরা। কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে দায় সারবে রেল। এভাবেই চলছে চলবে।

অবাধে চলছে জমি জবর দখল

প্রথম পাতার পর

রেলের উদ্বৃত্ত জমিতে ব্যবসার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যবসায়িক গোষ্ঠী স্থানীয় জমির মূল্যানুসারে বছরে ৬%, ব্যক্তিগত স্বার্থে অধিগ্রহণকারীরা ৬%, স্টীল–কয়লা–তেলের ব্যবসায়ীরা ১০%, পাকা দোকানের বিক্রেতারা বছরে ২০% হারে ফি জমা দেবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং রেলের জমিতে কৃষিকাজ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। রাজ্যসরকার রেলকর্মীদের শিশুদের জন্য বিদ্যালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে ৩০ বছর এবং কেন্দ্র সরকার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে ৯৯ বছর লিজ নিতে পারবে।

সাম্প্রতিককালে রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভুর ঘোষণা অনুযায়ী প্রকাশিত তথ্যানুসারে নতুন বেআইনি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ঐ এলাকার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দায়ী করা হবে এবং তা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। ১৯৯৩ সালের আইন অনুযায়ী নতুন অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কিনা, নিয়মিত পরিদর্শন হয় কিনা, অধিগ্রহণকারীরা নির্দিষ্ট সময়ে বরাদ্দ ফী জমা দেয় কিনা, দুর্বল এলাকাগুলি বাউন্ডারি দ্বারা সুরক্ষিত রয়েছে কিনা, বেদখল রুখতে রেলকর্মীরা কতটা তৎপর এই প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হতে চাননি খড়গপুর (দঃ পূঃ রেলওয়ে) শাখার ডিআরএম গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ শাখার 'ল্যান্ড সেল' বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় এবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রেলমন্ত্রক দ্বারা প্রকাশিত তথ্যটি সম্পর্কে তাঁরা যথাযথভাবে অবগত নন। ডিইএন অমিত কাঞ্চন বলেন রেলমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে আদৌ কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে 'গণমাধ্যমের কাছে কোনওরকম তথ্যপ্রকাশ করতে তিনি দায়বদ্ধ নন'।

সুরেশ প্রভু জমি জবরদখল রুখতে রেলের জমির ডিজিটাইজড ম্যাপিং এর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানালেও প্রকৃতপক্ষে তা কতটা বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ে সন্দিহান আপামর জনসাধারণ। স্থানীয় আধিকারিকদের দুর্নীতির সুযোগে রেলের উদ্বৃত্ত জমিতে রমরমিয়ে চলছে অধিগ্রহণ, নির্ধারিত ফি জমা পড়ছে না রেলমন্ত্রকের ঘরে। সর্ষের মধ্যেই ভূত থাকায় অধিগ্রহণ ঠেকাতে অপারগ প্রশাসন। অবাধে চলছে জমিদখল, চলছে বেআইনি ব্যবসা, তার সঙ্গে বিভিন্ন অসামাজিক কাজ। স্থানীয় আধিকারিকদের খুশি করতে পারলেই বরাদ্দ ফি দেওয়ার হাত থেকে সহজেই ফাঁকি দিতে পারছে স্থায়ী দোকানের ব্যবসায়ীরা। যথেচ্ছরূপে চলতে থাকা এই আইনের চোখে ধুলো দেওয়ার খেলা রুখতে, রেলমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী, শেষ পর্যন্ত কি কর্পোরেট সংস্থার দ্বারস্থ হতে হবে রেলমন্ত্রককে। সে বিষয়ে আপাতত অন্ধকারেই থাকতে হচ্ছে আমাদের। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মন্ত্রী এবার ক্ষেপে গিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, ফের জমি দখল হলে আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গদি ওল্টায়, রাজা পাল্টায়, পাল্টাচ্ছে কি পরিষেবার মান, দুর্নীতির সঙ্গে আপস আর কতদিন? আইন আর দুর্নীতির লুকোচুরি খেলায় কিস্তিমাৎ করবে কে? প্রশ্ন অনেক কিন্তু উত্তর দেবে কে, সকলেই যে দুষ্টচক্রে সামিল।

জখম গৃহবধূ

বিশ্বজিৎ পাল, উস্থি: মঙ্গলবার সকালে গুলিতে জখম হয় এক গৃহবধূ। জখম গৃহবধূর নাম আসিরা বিবি। সে কলকাতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থি থানার কারবালাহাট এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে উত্তর কুসুম গ্রামের বাসিন্দা আসিরা বিবি এদিন সকালে বাজার করে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় এক দুষ্কৃতী গৃহবধূকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুলি লাগে গৃহবধূর পিছনে। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে জখম গৃহবধূকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এ বিষয়ে গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা প্রতিবেশি হাবিব মোল্লার নামে অভিযোগ দায়ের করে উস্থি থানায়। তাদের অভিযোগ গৃহবধূ প্রেমে প্রত্যাখ্যান করায় সে ওই ঘটনা ঘটায়। পুলিশ জানান দুষ্কৃতিরা গুলি ছোঁড়ায় এক গৃহবধূ জখম হয়। সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্ত হবিব মোল্লার খোঁজ চলছে।

মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ট্রেন থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জি আর পি এবং আর পি এফ। জখম ব্যক্তিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং লোকাল ট্রেনটি সকাল ৭টায় ক্যানিং ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকে। সেই সময় ট্রেন যাত্রীরা এক ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় ট্রেনের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্যানিং জি আর পি এবং আর পি এফকে খবর দেয়। খবর পেয়ে জি আর পি এবং আর এফ পি জখম ব্যক্তিকে দেখার পরে ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার মৃত্যু হয়। বিষয়টি তারা ক্যানিং থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানান ট্রেনের মধ্যে এরা ব্যক্তিকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। দেহটি ময়না তদন্তের জন্যে হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তির আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৪ বছর বয়স হবে। তার পরিচয় এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে এটি খুন কিনা সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তার পরিচয় পত্র বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

রায়দিঘিতে প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেল। আগামী সপ্তাহ থেকে তার আকর্ষণীয় বিবরণ।

মানুষের কল্যাণসাধনই কল্যাণীর রাজনৈতিক ব্রত

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মূলতঃ কংগ্রেসী পরিবার থেকে উঠে এসেছেন উত্তর চব্বিশ পরগনার মছলন্দপুরের কল্যাণী হালদার। স্বামী নিধির রঞ্জন হালদার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে চাকরি করতেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। কল্যাণীদেবীর বাপের বাড়ি মছলন্দপুরের ঘোষপুরে এবং শ্বশুরবাড়ি মছলন্দপুরের চন্ডিপুরে। নিধিররঞ্জনবাবু চাকরির সুবিধার্থে হৃদয়পুরে ১৯৮৮ সালে বাড়ি করে সপরিবারে স্থায়ীভাবে চলে আসেন। চাতরা স্কুলে পড়াকালীন কল্যাণীদেবী ছাত্র রাজনীতিতে হাতেখড়ি। প্রথম সারিতে না তাকলেও রাজনীতিটা তখন থেকেই সক্রিয়ভাবে করে আসছেন, বলে জানালেন। দাদু প্রয়াত সরোজ বিশ্বাস ছিলেন তদানীন্তন কংগ্রেসী নেতা। তার সঙ্গে ১৯৭৬ সালে প্রথম বিধানসভাতে গিয়েছিলেন। সে সময় অপূর্বলাল মজুমদার ছিলেন বিধানসভার স্পিকার, বলে উল্লেখ করেন। ১৯৯৮ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস দল গঠন করলে, তিনি নেত্রীর নীতি–আদর্শের আকর্ষণে দলের জন্মলগ্নেই তৃণমূলে যোগদান করেন। সম্প্রতি তিনি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা তৃণমূলে যোগাদন করেন। সম্প্রতি তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। জানালেন, মানুষকে পরিষেবা প্রদানের জন্যই তার রাজনীতিতে আসা। তবে পদের জন্য কখনও লড়াই করেননি। বনগাঁ (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুরজিৎ বিশ্বাস তাঁর মামা হন। কিন্তু কোনও দিন সেই পরিচয় ভাঙিয়েও কোনও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায় করেননি। জানালেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করলেও কার্যতঃ রাজনৈতিক পদপ্রাপ্তি তার এই প্রথম। তবে এমনিতেই বিগত দশ বছর ধরে তিনি বারাসত পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন। কিন্তু কিছুটা পরিব্যাপ্ত পদ বলতে তার এই জেলা সম্পাদক পদ বলে উল্লেখ করেন। উন্নয়নের ভাবনা প্রসঙ্গে বলেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা–মাটি–মানুষের সরকার যে সব সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, তা এখনও অনেকেই জানে না। যেমন দুঃস্থ মাছ ব্যবসায়ীরা ব্যবসার সুবিধার্থে সাইকেল পায়, ফ্রিজ পায়, এমনকি দুঃস্থরা যে লোন পায়, তা আজও অনেকেরই অজানা। এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের জেলা সম্পাদক হিসেবে তিনি দুঃস্থদের সেইসব সরকারি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা পাইয়ে দিতে চান। নিজে দলমত নির্বিশেষে বিনামূল্যে বিউটিশিয়ান কোর্স করাচ্ছেন। যাতে মহিলারা স্বনির্ভর হতে পারেন। এছাড়া কল্যাণী প্রায় ১৬ বছর একটি প্রসাধনী ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। এই ব্যবসায়ে থাকার সুবাদে তার বিউটিশিয়ান কোর্সের প্রশিক্ষণ দেওয়াটা অনেকটাই সহজ বলে উল্লেখ করেন। তার মতে, রাজনীতিতে অসুবিধার দিক কি? এ প্রশ্নের উত্তরে খুব সহজভাবেই বলেন, 'ভালো কাজ করতে গেলে বিরোধীরা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। যার জন্য অনেক সময় মাঝপথে তা থমকে যায়। এটাই সব চেয়ে বড় অসুবিধা।' রাজনীতিতে আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করেন। তবে রাজনীতিতে আরও সামনের সারিতে এলে আরও ভাল পরিষেবা প্রদান করতে পারবেন বলে মনে করেন তিনি।

কল্যাণী হালদার

এ সপ্তাহের মুখ

অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক বিরোধী জমি বিল আইন বাতিলের দাবিতে উত্তর দিনাজপুর জেলার আইন অমান্য কর্মসূচি। বুধবার প্রবল গরম আর রোদকে উপেক্ষা করেও প্রায় হাজার শ্রমিক সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয় কর্ণজোরা বাসস্ট্যান্ডে। এখানে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বিপ্লব সেনগুপ্ত, নীলকমল সাহা, গৌতম চক্রবর্তী, চন্দন চৌধুরী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পরিতোষ দেবনাথ।

সমাবেশ শেষে বিশাল মিছিল কর্ণজোড়া প্রশাসনিক এলাকা ঘুরে এসে মিছিল শেষ হয় উত্তর দিনাজপুর জেলা শাসকের দফতরের সামনে। প্রতিবাদী মিছিল আটকাতে তিনটে ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখে পুলিশ। প্রথম ব্যারিকেড পেরিয়ে আসেন হাজার হাজার শ্রমিক। দ্বিতীয় ব্যারিকেডে শ্রমিকদের আটকায় পুলিশ। পাঁচ শতাধিক কর্মীকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা করেন কর্ণজোড়া থানার আই সি পিনাকী সরকার। পরে প্রত্যেককে জামিন দেওয়া হয়।

অমরনাথের অমর উপাখ্যান

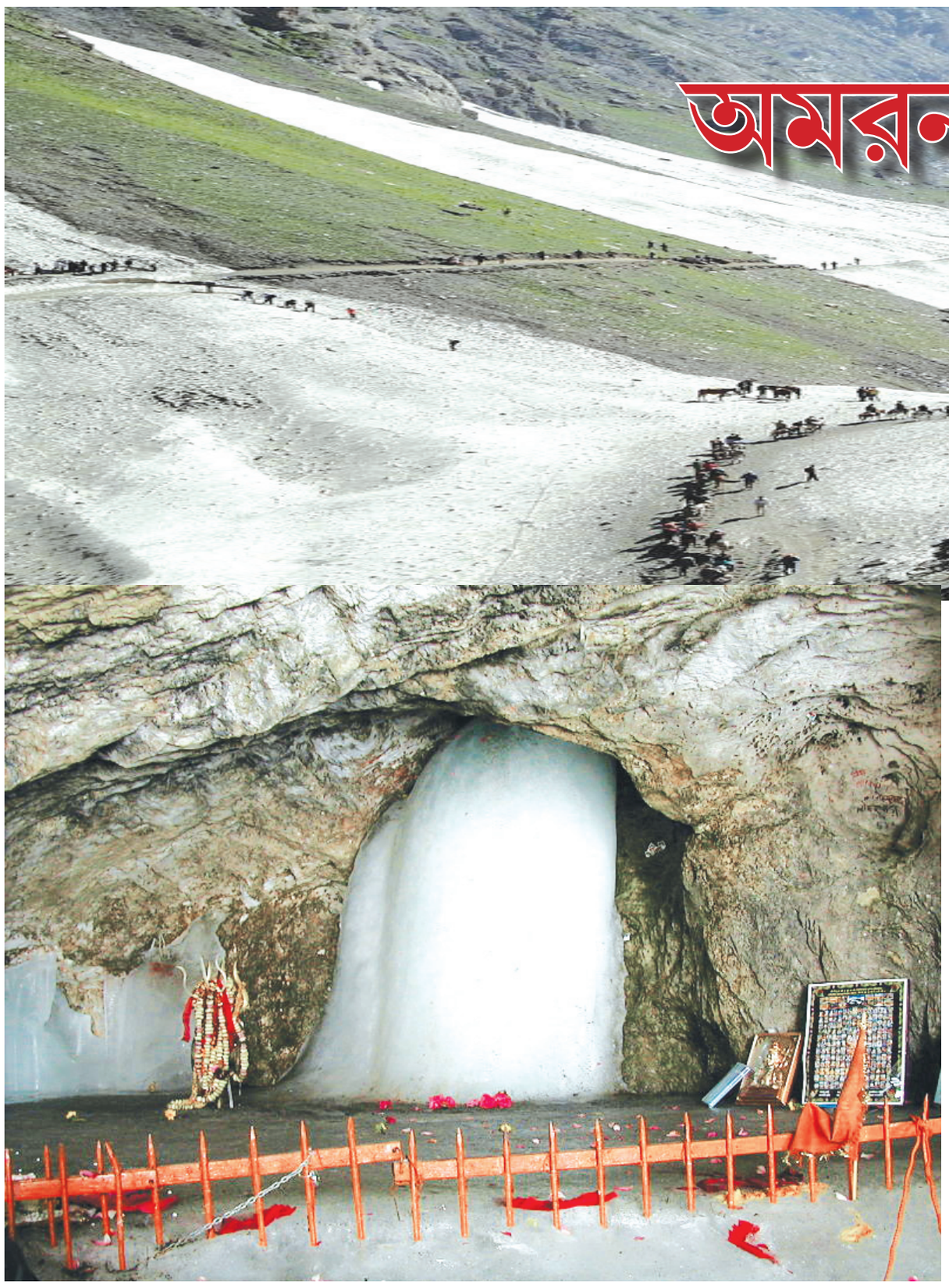

সুনীল কাউল

হিন্দুদের পরম কাঙ্খিত তীর্থযাত্রাগুলির একটি হল স্বামী অমরনাথজী দর্শন। কাশ্মীর রাজ্যের এই তীর্থস্থানে প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে (জুলাই–আগস্ট) দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাবেশ ঘটে যারা অমরনাথের গুহামন্দিরে মহাদেবের প্রতিরূপ এক তুষারলিঙ্গের উদ্দেশে ভক্তি–অঞ্জলি নিবেদন করেন। পুণ্যস্থানটি হিন্দু ধামগুলির একটি এবং এখানেই মহাদেবের অধিষ্ঠান বলে ভক্তদের বিশ্বাস। অমরনাথের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশ করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে, অনন্তনাগ জেলার ছোট অমরনাথজীর কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয় কারণ, এই তীর্থটি বিষয়ে অনেকেই ওয়াকিবহাল নন। তীর্থস্থানটি বিজবেহারা শহর থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানেও শ্রাবণী পূর্ণিমায় পর্বতশীর্ষে মহাদেবের গুহা মন্দিরে ভক্তরা সমবেত হন। আর ওই দিনই দু'মাস ব্যাপী স্বামী অমরনাথজী তীর্থযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়।

লৌকিক উপাখ্যান : অমরনাথ গুহাকে নিয়ে একটি লোককাহিনী প্রচলিত রয়েছে। বুটা মালিক বলে পরিচিত এক মুসলমান মেষপালক জনৈক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে একটি কয়লার বস্তা উপহার পান। বাড়ি পৌঁছে মালিক দেখেন যে বস্তাটি আদতে স্বর্ণপিণ্ডে ভর্তি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে বুটা মালিক সন্ন্যাসীর কাছে ফিরে যান তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য। সন্ন্যাসীর বদলে ওই একই জায়গায় তিনি এবার একটি গুহার অবস্থিতি লক্ষ্য করলেন। আর তখন থেকেই সেই গুহা তীর্থযাত্রীদের বার্ষিক গন্তব্যস্থল হয়ে ওঠে।

আর একটি উপকথায় বর্ণিত হয়েছে এই গুহাতেই মহাদেব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য এবং মানবজাতির মোক্ষলাভের সূত্রাবলি পার্বতীমাতার কাছে ব্যাখ্যা করেন। মহাদেব ও পার্বতীর ওই কথোপকথন এক জোড়া পায়রা শুনতে পায়। অমরত্ব লাভ করে ওই জোড়া পায়রা গুহামন্দিরেই অনন্তকালের জন্য আশ্রয়ে নেয়।

বালতাল হয়ে : পার্বত্যপথে স্বামী অমরনাথজী তীর্থযাত্রার সংক্ষিপ্ততম রুট কোনটি? এটি হল কাশ্মীর উপত্যকার গান্ডেরবাল জেলার বালতাল হয়ে। রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর থেকে বালতালের অবস্থান প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে আর পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় সোনমার্গ থেকে দূরত্ব প্রায় ১৫ কিলোমিটার। বালতাল থেকে সঙ্কীর্ণ গিরিবর্তের শুরু যা পৌঁছয় একাধিক স্রোতস্বীনির সঙ্গমে। আরও এগিয়ে পৃণ্যার্থীদের এবার আদিম হিমবাহের পিচ্ছিল পথে তিন কিলোমিটার হেঁটে স্বামী অমরনাথজীর পুণ্য গুহায় পৌঁছতে হবে। সাধারণত, এই দুর্গম পথে আবহাওয়া প্রায়ই প্রতিকূল হয়ে ওঠে এবং মুষল ধারায় বারিপাতের ফলে দর্শনার্থীরা অসুবিধার সম্মুখীন হন। অটুট ভক্তি আর বিশ্বাসকে সহায় করে এই কঠিন পথেই যাত্রীরা গুহামন্দিরে পৌঁছান। অমরনাথ যাত্রার অধিকাংশ দর্শনার্থী অবশ্য পহেলগাঁও–এর পথটি অনুসরণ করেন। বালতাল রুটটির আরেকটি বৈশিষ্ট হল এই পথে পুণ্যার্থীরা মাতা ক্ষীর ভবানীর মন্দিরের পবিত্র কুন্ডটির ভক্তি–অঞ্জলি নিবেদনের সুযোগ পান। অদূর ভবিষ্যতে যদি কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা বা বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকে তা হলে এই কুন্ডের জলের রঙ পরিবর্তিত হয় বলে অনেকের বিশ্বাস। খুব সম্প্রতি গত বছরের জুন মাসে জলের রঙ রক্তিম হয়ে ওঠে এবং তার প্রায় তিন মাস পর সেপ্টেম্বরের গোড়ায় বিধ্বংসী বন্যায় কাশ্মীর উপত্যকার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়।

পহেলগাঁও হয়ে : পহেলগাঁও হয়ে যেতে গেলে পুণ্যার্থীরা যাত্রাপথেই রঘুনাথজী মন্দির এবং অনন্তনাগের মার্তণ্ডে বিখ্যাত সূর্যমন্দির দর্শন করতে পারবেন। যাত্রার বেসক্যাম্প হবে খ্যাতনামা শৈলশহর পহেলগাঁও যার দূরত্ব শ্রীনগর থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার। পহেলগাঁও থেকে যাত্রীরা সড়কপথে, গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে যেতে পারবেন। স্রোতস্বিনী লিডারের পার্শ্ববর্তী শিবমন্দিরটিও ভক্তরা দর্শন করে থাকেন। নদীর অপর পাড়েও পর্বতশীর্ষে রয়েছে আর একটি দর্শনীয় শিবমন্দির। পহেলগাঁও শহরের সৌন্দর্য অতুলনীয়। তুষারশুভ্র পর্বতশ্রেণি আর ঘন অরণ্যের শ্যামলিমা শহরটিকে ঘিরে রেখেছে। জনশ্রুতি এই, এখানেই বাহন নন্দীকে রেখে মহাদেব পুণ্যগুহায় গিয়ে আশ্রয় নেন। এক সময় স্থানটির নাম ছিল বেলগাঁও যা কালস্রোতে পহেলগাঁও–এ রূপান্তরিত হয়।

পহেলগাঁও–অমরনাথ রুটের কয়েকটি হল্ট স্টেশন : পহেলগাঁও–এর বেস ক্যাম্প থেকে যাত্রা শুরু করলে প্রথম হল্টটি ১৬ মিলোমিটার দূরে চন্দন বাড়িতে। চন্দনবাড়ি অবধি গাড়িতে যাওয়া সম্ভব। এজন্য ন্যায্য দামে সরকারি পরিবহনের ব্যবস্থা আছে। লিডার নদী বরাবর এই পথের প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়নাভিরাম। ভক্তরা মনে করেন এখানেই মহাদেব তাঁর কপালে চন্দনচূর্ণ লেপন করেন তাই স্থানটির নাম চন্দনবাড়ি। চন্দনবাড়ি থেকে এর দুরূহ পথে পৌঁছাতে হবে পিসুটপ। পুণ্যার্থীদের সম্মিলিত হর হর মহাদেব জয়ধ্বনিতে যাত্রাপথটি অনুরণিত হয়। হয়তো এই জয়ধ্বনিতেই তাদের শ্রান্তি কিছুটা লাঘব হয়ে থাকে। পার্বত্যপথের চড়াই বেয়ে এই পর্বের যাত্রা শেষে পুণ্যার্থীরা বিশ্রাম নেন।

পরবর্তী যাত্রাবিরতি শেষনাগে, যেখানে ভক্তরা পুণ্য নির্ঝরে স্নান করার পর স্থানীয় আস্তানায় রাত্রিবাস করেন। কথিত আছে, এখানেই মহাদেব তার শেষনাগটিকে প্রস্রবণে রেখে গুহামুখের দিকে এগিয়ে যান। আসলে এই প্রস্রবণটি উত্তুঙ্গ পর্বতরাজিতে ঘেরা একটি সরোবর যার আকৃতি পৌরাণিক নাগের মাথার মতো।

এরপর রয়েছে অপার্থিব সৌন্দর্যমন্ডিত মহাগুনাস টপে যাবার দুরূহ চড়াইপথ। এখানে পর্বতশীর্ষের উচ্চতায় অক্সিজেনের অভাবে তীর্থযাত্রীদের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। মাথাঘোরা ও বমি–বমি ভাব হতে পারে। এই সময় হাতের কাছে শুকনো ফল, লেবু, টক বা মিষ্টি জাতীয় খাবার রাখা ভালো। যাত্রাপথের প্রায় সর্বত্রই প্রয়োজনসাপেক্ষে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে। আর সামনের পথটি পোশ পাথরির চারণ ক্ষেত্রে নেমে গিয়েছে যেখানে আছে অসংখ্য বুনো ফুলগাছ ও লতাগুল্মের সমাহার। বলা হয়ে থাকে যে এখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলে বুনো ফুলের গন্ধের মাদকতা মানুষকে নিদ্রাচ্ছন্ন করতে পারে। জায়গাটি পেরিয়ে এবার যেতে হবে পঞ্চতরণী অভিমুখে। শুভ্র বরফে ঢাকা পাঁচটি পর্বতচূড়া আবেষ্টন করেছে পঞ্চতরণীকে যেখানে যাত্রীরা বিশ্রাম ও রাত্রিবাস করে থাকেন। পরদিনই খুব প্রত্যুষে শুরু হয় চূড়ান্ত গন্তব্য অর্থাৎ মহাদেবের পুণ্যগুহার উদ্দেশ্যে যাত্রা। গুহামন্দিরে যাবার পথে চোখে পড়বে অমরাবতী ও পঞ্চতরণী স্রোতস্বিনীর সঙ্গমস্থল। গুহামন্দির দর্শনের আগে পুণ্যার্থীরা এই অমরাবতীতেই অবগাহন করে থাকেন।

ছড়ি মোবারক : পুরোহিত, সন্ন্যাসী আর তীর্থযাত্রীদের নিয়ে ছড়ি মোবারকের যাত্রা শুরু হয় শ্রীনগরস্থিত দশনামী আখড়া থেকে। পুজো–আর্চা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর গুহামন্দিরের পথে ছড়ি মোবারক যায় শঙ্করাচার্য মন্দির ও দুর্গানাগ মন্দিরে। পদযাত্রায় আরও কয়েকটি মন্দিরে ভক্তি–অঞ্জলি নিবেদন করা হয়। ভক্তদের মন্ত্রোচ্চারণ ও ভজনসঙ্গীতে যাত্রা পথে সকলেই উজ্জীবিত হন।

শ্রাবণ পূর্ণিমা অর্থাৎ রক্ষাবন্ধনের দিনটিতে ছড়ি মোবারকের সকলে স্বামী অমরনাথজীর চূড়ান্ত দর্শন লাভ করেন। সমাপ্তি ঘটে লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর তীর্থযাত্রার। গত বছর শ্রী অমরনাথজী দর্শনে গিয়েছিলেন ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৯০৯ জন পূণ্যার্থী।

কয়েকটি সতর্কতা : দুর্গম এই তীর্থযাত্রায় পুণ্যার্থীদের কয়েকটি সতর্কতা মেনে চলা আবশ্যক। চলার পথে ভারসাম্য রক্ষার জন্য সঙ্গে লাঠি থাকা প্রয়োজন, হাঁটার সুবিধার জন্য পরতে হবে স্পোর্টস শ্যু, এছাড়া সঙ্গে যতে হাল্কা মালপত্র থাকে ততই সুবিধা প্রবল ঠাণ্ডা ও হিমেল বাতাসকে প্রতিরোধ করতে গরম পোশাক অবশ্যই পরতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ববর্তী বছরগুলিতে অমরনাথ যাত্রায় গিয়ে যাঁদের মৃত্যু হয় তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই যথেষ্ট গরম পোশাক ছিল না।

অমরনাথ যাত্রায় পুণ্যার্থীদের কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে তা শ্রী অমরনাথজী মন্দির পর্ষদের ওয়েবসাইট www.shriamarn ahjishrine.com–বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র এবং রাজ্যভিত্তিক ঠিকানা–সহ ব্যাঙ্ক শাখার তালিকা উল্লেখিত হয়েছে যেখানে গিয়ে আবেদনকারীরা এ বছরের যাত্রার জন্য নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।

কলকাতার 'নতুনবাজার' আদপে আর নতুন নেই

দীপককুমার বড় পণ্ডা

কয়েকদিন আগে সক্কাল সক্কাল নতুনবাজারে পৌঁছেছিলাম। তখনও সব দোকান খোলেনি। দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ। একটা ক্লান্তি যেন সেই বন্ধ দরজায়। ইংরেজরা কলকাতায় আসার আগে এখানে দুটো বাজার ছিল – বড়বাজার এবং সুতানটীর হাট বা হাটখোলার বাজার। একসময় বরানগরে তাঁতিরা থাকতেন। ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বরানগরের তাঁতিদের দিয়ে শেঠরা কাপড় তৈরি করাতেন। পরবর্তীকালে শহিদ মিনারের কাছে একটা কাপড় বানানোর কারখানা তৈরি হয়। একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, সুতানটীর হাট তখন বৃহস্পতিবার এবং রবিবার বসত। যে সকল পণ্য এই বাজারে বিক্রি হত এবং তা থেকে শুল্ক তোলা হত, সেগুলির মধ্যে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যগুলি হল সুতা, সরষে প্রভৃতির তেল, লোহা–লক্কড়, তালের গুড়, মিঠাই, লোহার জিনিস, রূপার জিনিস, তাঁতের কাপড়, লবণ, মাদুর, কাঁসার জিনিস, হাঁড়ি–কলসি, কাপড়, জুতা প্রভৃতি।

বড়বাজারের কাশীনাথ বর্মন নতুন বাজারের পত্তন করেছিলেন। নতুনবাজার তৈরি হয়েছিল ১৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু কাশীনাথ–এর বংশধররা এটা টিকিয়ে রাখতে পারেননি। সেই কারণে মল্লিকদের হাতে ওটা চলে যায়। এখানে এখন প্রচুর দোকান।

নতুনবাজারে কাঠের বারকোশ, সিংহাসন, লেটারবক্স, তাড়ু (মিষ্টি দোকানে খুন্তির কাজ করে), ছানা ও খোয়াক্ষীর প্রভৃতির অনেক দোকান। বারকোশ তৈরি হয় শিরিষ কাঠে। মিষ্টির দোকানের যাবতীয় কাঠের সরঞ্জাম এই দোকানগুলিতে পাওয়া যায়। মিষ্টি দোকানের জন্য দরকার হয় বারকোশ, তাড়ু, পার্টা, কড়াই প্রভৃতি। তৈরি হয় এখানে। তৈরি হয় রুটি বেলার সরঞ্জাম। কাছেই আছে 'দয়েপটি'। এখানে প্রচুর দুধেরড্রাম এসে জমা হয়। ছানার দোকানের পর আছে কাঁসা–পিতলের আড়ৎ। পাওয়া যায় কাঁসা–পিতলের থালা, ঘটি, বাটি, গ্লাস, কলসি, পিলসুজ, দেবদেবীর নিরেট ঢালাই মূর্তি প্রভৃতি।

নতুনবাজারে বেশ কয়েকটি দোকানে মিষ্টান্নের ছাঁচ তৈরি হয়। কাঠের কিংবা পোড়ামাটির বা পাথরের এই ছাঁচগুলিতে কতরকম লেখা থাকে, যেমন, গাত্রহরিদ্রা, শুভবিবাহ, ফুলশয্যা, মিলনরাত্রি, নাচেময়ূরী, গলদাচিংড়ি, মাছ, প্যারাডাইস প্রভৃতি। অনেকসময় মহিলারা এগুলি যত্ন করে কুরে কুরে তৈরি করতেন। 'বিভিন্ন আকারের, বিবিধ নকশার এরকম এক প্রস্থ ছাঁচ প্রায় সকল গৃহস্থ ঘরেই যত্নে রক্ষা করা আবশ্যিক ছিল। এখনও খুঁজলে, বহু পরিবারের প্রাচীনাদের জীর্ণ সিন্দুক থেকে হয়ত সেগুলি উদ্ধার করা যেতে পারে। কিন্তু অনটনমুক্ত, অবসরবহুল যে প্রসন্ন জীবনের সেগুলি প্রতীক তার পুনরুদ্ধার আজ যদি সম্ভব হত, তা হলে আর একটু লাবণ্য, আর একটু সুষমা হয়ত আবার ফিরে আসত বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনে।' (অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি, ১৩৮৬)

মহেন্দ্রনাথ দত্ত–র স্মৃতিচারণা থেকে জানা যাক সেই সময়ের কথা। 'প্রাচীন বৃদ্ধারা দুপুরবেলা আহারের পরে বসিয়া অনেক প্রকার মাটির ছাঁচ কাটিতেন। এইটা তখন শিল্পনৈপুণ্যের ভিতর ছিল, কারণ বাটিতে তখন নারিকেলের চন্দ্রপুলি ও ক্ষীরের ছাঁচ হইতে এবং ছাঁচ কাটাতে

যাহার হাত বিখ্যাত হইত পাড়ার লোক আসিয়া তাহার নিকট হইতে ছাঁচ লইয়া যাইত .... অনেকে ইহাতে কিছু কিছু উপার্জনও করিতেন।'

সেই ছাঁচের ইতিহাস এখনও টিকে আছে। নতুনবাজারে 'মডার্ন আর্ট কোং' সন্দেশের ছাঁচের দোকান। এই দোকানটি তৈরি করেছিলেন প্রয়াত কিশোরীমোহন দাস। সেগুন, কদম প্রভৃতি কাঠে ছাঁচ তৈরি হয়। এই শিল্পীরা আগে ছাপার ব্লক তৈরি করতেন। সেই ব্লক বিক্রি বন্ধ হতে শিল্পীরা সন্দেশের ছাঁচ তৈরি শুরু করলেন বেশি করে। এখন ছাঁচ বিক্রি হয় ২০ থেকে ৩০ টাকায়। ছাঁচ অর্ডার দিয়েই কেনা বেচা হয়। যে মিষ্টি দোকানে যেমন মাপের ছাঁচ লাগে তেমন আকারের ছাঁচ করতে হয়। এখন মেসিন এসে যাওয়ায় মিষ্টি দোকানে কাঠের ছাঁচ আর লাগছে না। শুধুমাত্র বড় বড় দোকানগুলিতে পুরনো কাঠের ছাঁচ ব্যবহার হয়। তাই ছাঁচ শিল্পী সুভাষ দাস (৫৯) কিংবা অসীম দাস–রা (৫০) বলছেন, 'আগামী দিনে এটা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে পুজোর সময় ছাঁচের চাহিদা খানিকটা বাড়ে, আর বর্ষাকালে চাহিদা কমে।'

সারা পশ্চিমবঙ্গে যাত্রার একসময় খুব কদর ছিল। জেলায় জেলায়তো যাত্রার দল ছিলই, এরসঙ্গে ছিল কলকাতার যাত্রার দল। সেই দলগুলি আড়ৎ হল নতুনবাজারের পাশে চিৎপুর। চিৎপুরের যাত্রাদলগুলির খুব নাম। যাত্রার দলে অভিনেতারা নানারকম সাজসজ্জা করতেন। এখানে নানারকম ঢাল, তরোয়াল, বুক প্লেট, হ্যান্ড প্লেট, মাথার মুকুট প্রভৃতি তৈরি করত যে দোকানটি, তাদের নাম 'দাস কোং'। সিনেমায় ব্যবহৃত অস্ত্রও এঁরা এখন বানান। দোকানের মালিক গর্বিত কাশীনাথ দাস বলছিলেন, 'সীতা, বেদের মেয়ে জোছনা'র সোড, টুপি আমরা তৈরি করেছিলাম। তরুণ অপেরার শান্তিগোপাল যখন ক্রীতদাস অভিনয় করেছিলেন, তখন আমাদের যাত্রার বইটা দিয়েছিলেন। বই–এর ছবি অনুযায়ী সোড, গ্রিক সোড, মাথার মুকুট, বুক প্লেট, হ্যান্ড প্লেট প্রভৃতি তৈরি করে দিয়েছিলাম।'

৬২ বছর বয়সে অন্য দুইজন বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন কাশীনাথ। এখন মোট তিনজন কাজ করলেও একসময় এখানে ৪০–৪৫ জন কাজ করেছেন। কাশীনাথ বললেন, 'আমরা চলে গেলেই জেনারেশন শেষ।' যাত্রায় সোড বা অন্যান্য জিনিস আর লাগে না। তবে এখন এখানে তৈরি হয় তামার সাপ, মন্দিরে পেতলের চূড়া, পেতলের সিংহাসন, দুর্গা কিংবা অন্যদের পেতলের অস্ত্র। পেতলের অস্ত্রের ওপর গোল্ডেন কিংবা সিলভার কালার হয়। এখন অবশ্য যাত্রার কোনো জিনিস তৈরি হয় না। কারণ এখন ঐতিহাসিক কাহিনীর পরিবর্তে সামাজিক পালাতেই গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়। আগে এখানে তিনকড়ি দাসের দোকান ছিল, তাঁরাও এই কাজ করতেন, কিন্তু এখন যাত্রার কাজ প্রায় ২০ বছর

যাওয়া আসার পথে পথে

বন্ধ। এখানকার কর্মী অশোক চক্রবর্তী (৭০) বলছিলেন, 'আগে রাত ২টা ৩টা পর্যন্তও কাজ করতাম। আর এখন হাতে কোনো কাজ নেই।' একশ বছরের পুরনো দোকানটি টিনের চাল, চারদিকে ইটের দেওয়াল। জায়গাটি জমিদার বিশ্বরঞ্জন বসাক–এর।

হাতুড়ি, কাতুরী, ছেনি, নেহাই, কাঠের মুগুর, সাবল দিয়ে মনসার সাপ বানিয়ে চলেছেন কাশীনাথ এবং অশোক। একজন সাপের ফনা তৈরি করছেন, অন্যজন সাপের লেজ। তবে বলে না দিলে বোঝার উপায় নেই, এরা মালিক এবং কর্মচারী। এ নিয়ে অবশ্য অশোক–কাশীনাথের কোনো মাথা ব্যাথা নেই। তাঁরাতো ৫৭ বছর একসঙ্গে এইভাবেই কাজ করছেন। এখনতো বাঁচার লড়াইটা দু'জনের। সেটা ওরা ভালো করে টের পেয়েছেন। অবশ্য আজ সমস্যা আসছে বলে নয়, মালিক–কর্মচারির প্রাচীন এই সম্পর্কের গভীরতাতো সবক্ষেত্রেই ছিল।

একটু এগোলেই কাগজের তৈরি বাক্সের প্রচুর দোকান। এইসব নানা রঙের বাক্স ব্যবহার হয় বিয়েতে, বিশেষ করে মাড়োয়ারিদের বিয়েতে। এগুলিকে বলে দৌড়া এবং সুগ্গা। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের মানুষদের বিয়ের তত্ত্বে এই দৌড়া এবং সুগ্গা লাগে। একটি লম্বা কাঠির গায়ে কাঠের তোতাপাখি লাগানো থাকে 'সুগ্গা'য়। বিয়েতে ব্যবহার হয় ফ্যান্সি ট্রে। সেগুলিও পাওয়া যায় এখানে। বাঁশের ওপর নানারকম রঙিন কাগজ জড়ানো ট্রে–র বেশ কয়েকটি দোকানে। ৫–৬ বছর আগে সাধারণ ট্রে পাওয়া যেত। সেগুলি এত রঙিন ছিল না। ইদানিংকালে রঙিন ট্রে বেশি ব্যবহার হচ্ছে। এখন অবশ্য বাঙালি–অবাঙালি সবাই এই ট্রে ব্যবহার করছেন। এইভাবেই নানা জিনিস দেখতে দেখতে এগোতে থাকি। সূর্য তখন মধ্য গগনে। এবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ঢুকে পড়ি।

মাঙ্গলিকী

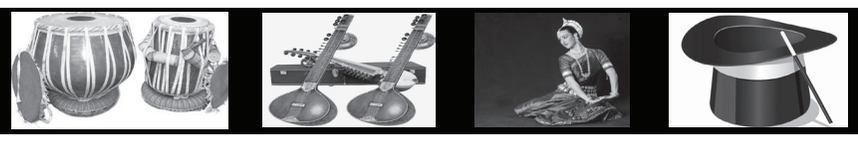

বড়িশার জাদু আড্ডায় সংবর্ধিত হলেন জাদুকর সমীর গুহ ঠাকুরতা ও শ্রীমতী গুহঠাকুরতা

২০১৩ এর এপ্রিলে শুরু হয়েছিল বড়িশার জাদু আড্ডা। শুরু করেছিলেন বড়িশা নিবাসী আজীবন সৌখিন জাদুকর সমীর গুহ ঠাকুরতা তাঁর বাসভবনে। তাঁর এই ইচ্ছাকে বরাবর সহায়তা দিয়ে এসেছেন শ্রীমতী গুহঠাকুরতা বস্তুতঃ তিনিই হলেন এই আড্ডার 'জননী'।

বড়িশার জাদু আড্ডায় প্রথম দিন থেকে যুক্ত আছেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক, জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন প্রয়াত পেশাদার জাদুকর এন সি সরকার। অশোক বিশ্বাস, দীপক মজুমদার প্রমুখও প্রথম দিকে নিয়মিত আসতেন আড্ডায়। তাঁর আকস্মিক পরলোক গমনের আগে অবধি (মাত্র ৫৭ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন)। ভবানীপুর নিবাসী সফল পেশাদার জাদুকর স্বরক্ষেপক শিল্পী প্রদীপ সরকার (পি কে) তাঁর প্রদর্শনী না থাকলে নিয়মিত আসতেন এই আড্ডায়। তিনি বলতেন, তাঁর পেশাদার জাদু জীবনের বাইরে এই জাদু আড্ডায় এলে তিনি 'প্রাণের শান্তি' পান। শ্রী সরকার মাঝে মাঝে আড্ডায় স্ট্যান্ড আপ জাদুও দেখাতেন। যাতে থাকতো পেশাদারিত্বের ছাপ। ভারত উপমহাদেশ খ্যাত জাদু প্রশিক্ষক প্রয়াত জাদুকর গৌতম গুহও এই আড্ডায় এসেছেন, জাদু দেখিয়েছেন। অস্ত্রের জাদুকর 'লে' এই আড্ডায় প্রথম দেখিয়ে গিয়েছেন শেপোগ্রাফি (একটি কাগজকে বিভিন্নভাবে ভাঁজ করে বিবিধ ধরনের টুপি তৈরি করার শিল্পকলা)। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জাদু স্রষ্ঠা, জাদু লেখক, অস্ত্রেরই যুবা জাদু প্রতিভা জি. শ্রীনিবাস বেশ কয়েকবার এই আড্ডায় নতুন নতুন জাদুর খেলা দেখিয়ে গিয়েছেন। শিখিয়েও গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে এই আড্ডায় আরও জাদু দেখিয়ে গিয়েছেন বরিষ্ঠ অস্ত্রেরই জাদুকর শ্রী প্রকাশ। জার্মানী নিবাসী জাদুকর এ নন্দী, ইংল্যান্ড নিবাসী জাদুকর এম. কে দত্ত, ইংরেজ জাদুকর রণ চ্যাটবার্ন, জেমস ওয়ার্ড এই আড্ডায় জাদু দেখিয়েছেন, সংবর্ধিত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক জাদু পত্রিকা অ্যাবরা সহ আরও কয়েকটি বিদেশি জাদু পত্রিকায় এই আড্ডার সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং আড্ডার যখন ১২ বছর পূর্ণ হল তখন আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমীর গুহ ঠাকুরতা–শ্রীমতী গুহ ঠাকুরতাকে আড্ডায় যাঁরা নিয়মিত আসেন, তাঁরা সংবর্ধনা জানাবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। আর সেটাই করা হল ১৫/৩/১৫ তারিখে, যে আড্ডায় উপস্থিতির সংখ্যা ২০ ছাপিয়ে গেলো। প্রথমে আড্ডার শুভ উদ্বোধন হল জাদুপ্রেমী সঙ্গীতশিল্পী মায়া বালা ঠাকুরের গান দিয়ে। এরপর সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, বড়িশার জাদু আড্ডার ১২ বছর পূর্ণ হল, তা সম্ভব হল একটি মাত্র কারণেই— আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমীর গুহ ঠাকুরতা শুধু জাদুকলা নয়, জাদুকরদেরও ভালবাসেন প্রাণ দিয়ে। আর অবশ্যই তাঁর সঙ্গে রয়েছেন শ্রীমতী গুহঠাকুরতা। যিনি প্রকৃতই এই আড্ডার জননী। অতঃপর সমীর গুহ ঠাকুরতা শ্রীমতী গুহ ঠাকুরতাকে সামনে রেখে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে উষ্ণ করতালি দ্বারা এই দম্পতিকে হৃদয়ের গভীরতম ভালবাসা জানালেন, এই সঙ্গে অভিবাদন ও অভিনন্দন জানালেন। এরপর শ্রীমতী গুহ ঠাকুরতার হাতে তুলে দেওয়া হল পুষ্প স্তবক। সমীর গুহ ঠাকুরতার হাতে সুদৃশ্য ল্যামিনেটেড মানপত্র (তৈরি করেছেন আড্ডার রেসিডেন্ট ম্যাজিসিয়ান গোরা দত্ত) তুলে দিলেন বরিষ্ঠ জাদুকর, প্রবন্ধক ভি এম ঘোষ, সঙ্গে রইলেন গোরা দত্ত, সতীপ্রসাদ সরকার, শৈলেশ্বর মুখার্জী, সঞ্চালক প্রমুখ। ভি এম ঘোষ, গোরা দত্ত, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সমীরবাবুর হাতে তুলে দিলেন জাদুর খেলা সহ বিবিধ উপহার। তবে আগে সুরচিত মানপত্রটি পড়ে দিলেন এটির রচয়িতা গোরা দত্ত। সমীর গুহ ঠাকুরতা সব সময়েই মিতবাক ব্যক্তি। এদিনও সামান্য কয়েকটি কথা বললেন এই আড্ডা শুরু করার বিষয়ে। তারই মাধ্যমে আরও একবার বোঝা গেলো তিনি প্রকৃতই সব জাদুকরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন— বস্তুত এই প্রতিবেদক দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারেন, সমীর গুহ ঠাকুরতা হলেন বাংলার জাদু জগতে এক 'অজাতশত্রু ব্যক্তি'।

অতঃপর বৈঠকীও স্ট্যান্ড আপ জাদুতে মাতলেন আসরে উপস্থিত জাদুকরবৃন্দ। এঁরা হলেন ভি এম ঘোষ (জ্যাক হিউজের বিখ্যাত মুদ্রার খেলা), দেব মল্লিক (স্ব সৃষ্ট সুন্দর ছবির তাসের দৃশ্যমান জাদু), দিব্যেন্দু নাথ (পাশ্চাত্যের স্ট্রিট ম্যাজিসিয়ানের পোষাকে অসাধারণ বৈচিত্রময় বিবিধ বৈঠকী জাদু), এস পাল (সুচারু ধীর গতিতে প্রদর্শিত ও কারেন্সি নোটের স্ট্যান্ড আপ জাদু), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জি. শ্রীনিবাসের দেশলাই বাক্স ও ঘুঁটির জাদু— খেলাটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য), গোরা দত্ত (অনবদ্য স্বসৃষ্ট রঙ নিয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী ও ভৌতিক রুমালের জাদু), আর ডি (বৈঠকী নিখুঁত মুদ্রার জাদু—ইলিউশান ধর্মী জাদু প্রদর্শনীর অভিজ্ঞতার আলোকে মঞ্চ জাদু প্রদর্শনীর বিষয়ে মূল্যবান। বক্তব্য রাখেন)। আসরে বিশেষ আমন্ত্রিত জাদু প্রেমী কবি বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার পড়লেন তাঁর 'সিগনেচার পিস' কবিতা 'কলোনির সেকাল, একাল'। সতীপ্রসাদ সরকার এই প্রসঙ্গেই বললেন অতীতে উদ্বাস্তু হিসাবে কঠিন জীবন সংগ্রামের কথা আর এই ভাবেই পরবর্তীকালে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার কথা। এদিন খুঁদে জাদুকর বিশ্বক তার বন্ধু লক্ষ্মণকে (সমীরবাবু) কিছু উপহার দিল। অনুপ চক্রবর্তী পুষ্প স্তবক শ্রদ্ধার সাথে তুলে দিলেন আড্ডার 'জননী'–র হাতে। এদিন ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান ছিল সমীর গুহঠাকুরতার পরিবেশিত রবীন্দ্র সঙ্গীত— নিয়মিত চর্চা ছাড়াও তাঁর গান সকলের হৃদয় ছুঁল।

আসরের শেষ পর্বে আড্ডায় উপস্থিত হন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ। বিশেষ অভিনন্দন জানালেন সমীর গুহ ঠাকুরতাকে, তাঁর সকলকে নিয়ে পথ চলার মনোভাবের জন্য আরও বললেন, সমীরবাবুর এই মনোভাবেরই জন্যই তিনি আজ নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির বিশিষ্ট আমন্ত্রিত সদস্য... জাদু আড্ডার জুয়েল সদস্য জাদুকর স্যামুয়েল, তরুণ সাংবাদিক জাদুকর প্রিয়ম গুহ এদিন বিবিধ কাজের মাধ্যমে আড্ডাকে সচল রাখেন।

সমীর গুহ ঠাকুরতার পারিবারিক বন্ধু পেশায় ইঞ্জিনিয়ার তথা নেশায় সংস্কৃতি প্রেমী সমীর সেনগুপ্ত এদিন আসরের শেষে এই প্রতিবেদককে সমীর গুহ ঠাকুরতার পিতা মাতার কথা, তাঁদের পরিবারের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির কথা বললেন— সেই আলোকেই বোঝা যায় সমীর গুহ ঠাকুরতার উদার মানসিক গঠনের কথা।

এদিন আসরে আরও উপস্থিত ছিলেন জাদুকর তপন মিত্র, প্রিন্স এস লাল প্রমুখ। সকলকে বিরাট জলযোগে আপ্যায়ন করেন আড্ডার জননী শ্রীমতী গুহঠাকুরতা। সমীর গুহ ঠাকুরতার সংবর্ধনা সাফল্যমণ্ডিত করতে বিশেষ সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জাদুকর ভি এম ঘোষ, সতীপ্রসাদ সরকার, শৈলেশ্বর মুখার্জি, এস পাল অনুপ চক্রবর্তী, স্যামুয়েল, প্রিয়ম গুহ, সঙ্গীতশিল্পী আড্ডার 'সেবিকা' মায়াবালা ঠাকুরকে। বিশেষ হার্দিক অভিনন্দন রেসিডেন্ট ম্যাজিসিয়ান গোরা দত্তকে।

পত্র–পত্রিকা–পুস্তক আলোচনা

অরূপ রতন

তারুণ্য

(সম্পাদক – সুকুমার মণ্ডল) (বর্ষবরণ ১৪২২/এপ্রিল ২০১৫ সংখ্যা)—পশ্চিম পুটিয়ারীর তরুণ দলের উদ্যোগে প্রকাশিত প্রত্রিকাটি ২৯ বর্ষে পৌঁছালো। এই সংখ্যাটিও বিগত দুই শারদ সংখ্যার মতো তিন ফর্মায় গড়া, তবে কি পত্রিকাটি এখন থেকে ৪৮ পাতারই হবে। কালবৈশাখীর পরে নামা বৃষ্টিতে ভিজছে কিছু ছেলে, সাদাকালো এই প্রচ্ছদই নজর কাড়ে। পরিবেশ সচেতনতার ওপর একগুচ্ছ শীর্ষ রচনা ঠাঁই পেয়েছে, ওরই মধ্যে ব্যতিক্রমী নিবন্ধটি ডঃ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই বিভাগে অন্যান্যদের মধ্যে ডঃ অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ্তা সরকার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কবিতা অংশে অরুণ কুমার মান্না, অশোক কুমার পাত্র, অমর কুমার দাস, আব্দুল হান্নান, আরতি ভট্টাচার্য, বিধান সাহা, বৃন্দাবন দাস, কালীশংকর বাগচী, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু, রবীন্দ্রনাথ দাস, তাপস মাইতি খুব বলিষ্ঠ কবিতা হাজির করেছেন। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের তিস্তাবুড়ির পুজো পার্বণ (অলোকানন্দ দাস) নিবন্ধটি মূল্যবান। বিকাশ ব্যানার্জীর ইকো পয়েন্ট গল্পে নতুন স্বাদের আভাস পাওয়া গেল। প্রবীর নন্দী–র লেখা স্বামীজির মানস কন্যা নিবন্ধটি সুলিখিত। শেষ পাতায় হাসতে মানা শিরোনামে এক গুচ্ছ কৌতুকী ইতিমধ্যেই পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে, এবারের প্রসঙ্গ বৈশাখ। (পত্রিকার ঠিকানা – ৩২০, ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান), পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা ৭০০ ০৪১। দূরভাষ ৯৯০৩৮৩৫৬১১)

আজাদ মানবাধিকার

(সম্পাদক–তাপস চট্টোপাধ্যায়) সংবাদ পাক্ষিক মার্চ ২০১৫ সংখ্যা বর্তমান সংখ্যাটি মানবাধিকার প্রসঙ্গে নিত্যান্দ দাসের লেখা নিবন্ধ রয়েছে। রয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন রাজ্যে নানা ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ও প্রতিকারের প্রস্তাব সম্বলিত ঘোষণা। শিশু–শ্রমের উপর লেখা স্বয়ং সম্পাদকের নিবন্ধটিও আমাদের বাস্তবের দিকে নজর ফেরায়। ডঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী ও দেবযানী সমাদ্দার এর দুটি কবিতা রয়েছে, দুই লেখিকাই সেই নারী নির্যাতন ও শিশু–নিগ্রহের কথাই লিখেছেন। আজকের দুনিয়ায় আর বহুভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। সেদিকেও কবিদের দৃষ্টিপাত হোক (পত্রিকার ঠিকানা–১৪৩/৫, শিবপুর রোড, হাওড়া–৭১১ ১০২। ফোন : ৯৪৩১৫৭৫৯৭৮)

মন ক্যামেরা

(এপ্রিল ২০১৫ –সম্পাদক ড. রূপালী বিশ্বাস) তিন ভাঁজে গড়া নতুন পত্রিকাটি ভূমিষ্ঠ হল। চোট আয়তনের মধ্যেও বেশ কিছু রঙিন ও অনেকগুলি সাদাকালো ছবি ছাপা হয়েছে। কাজে কাজেই এটিকে রঙিন ম্যাগাজিন বলতেই হচ্ছে। ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের নিবন্ধ (অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক সুভাষচন্দ্র বসু)টি আজো সময়োচিত। সুনীল মুখোপাধ্যায়ের কবিতাটি স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শ এনে দেয়, বিধান সাহার কবিতাটিও রসোত্তীর্ণ। তারাশঙ্কর দত্তের ছড়াটি নিয়ে শেষের পাতা জমজমাট। প্রচ্ছদ বাদ দিয়ে বাকি পাঁচটি ভাঁজের মধ্যে একটি গোটা পাতা জুড়ে সম্পাদকীয়। সেটা কি প্রথম সংখ্যা বলেই! (পত্রিকার ঠিকানা–৭৮ মাখলা মানিকতলা, পোঃ মাখলা (উত্তরপাড়া), হুগলি ৭১২২৪৫। ৯২৩০০৬৬৭৭১)

সাহিত্য সমন্বয়

(উত্তর কলকাতা বাংলা ভাষা চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা সংখ্যা ২০১৫) (সম্পাদক – জয়ন্ত রসিক, মানিক দে, বিপ্লব মজুমদার, শান্তিদেব ভট্টাচার্য) গোপাল চক্রবর্তীর নিবন্ধটি বড়ই সংক্ষিপ্ত। আলোচনায় বিস্তৃতির অভাব চোখে পড়ে এছাড়াও আরও কয়েকটি নিবন্ধ রয়েছে। তার মধ্যে ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের ঈশ্বর এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্যতিক্রমী লেখা। পরিতাপের কথা, গত দুশো বছরে আমরা রামমোহন রায়–বিদ্যাসাগর–বিবেকানন্দ–সুভাষ বসুদের পেয়েও ধর্মের গোলামী থেকে মুক্ত হতে পারিনি আজও। এছাড়াও একগুচ্ছ কবিতা রয়েছে। ওয়াজেদ আলি, কানন পোড়ে, সুনীল মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত প্রমুখের কবিতা উল্লেখ করতেস হয়। ভাষা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ক কবিতাও রয়েছে, কিন্তু সেগুলো এমন মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হল কেন। অন্তত। ভাষার উদ্দেশ্যে লেখা গুলিকে একত্রিত করলে আরও আঁটোসাঁটো হত। প্রচ্ছদ চমৎকার। (পত্রিকার ঠিকানা–১৮ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০ ০০৯। ফোন–৯৮৩৬৬৫০৩২০/৯০৭৭৯৬২৯৯)

অনুরণন

(সমরশংকর চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন) (সন্ধ্যা প্রকাশন, ১৪/১ রাজা লেন, কলকাতা–৭০০ ০০৯। দাম ১০০ টাকা) ঝকঝকে ছাপা দুরন্ত প্রচ্ছদে মোড়া শতাধিক পাতার বেশি এই কবিতার বইয়ে নানা ভাবনার কবিতারা দিব্যি জায়গা করে নিয়েছে। কবির পেলব দৃষ্টি কলকাতার প্রাচীন সৌধ, শহুরে জীবন–যাত্রা, গ্রামীণ চিত্র, উধাও বাউল মন বারে বারেই পাঠক–কে চেনা গণ্ডীর সীমা পার করে বাইরে টেনে নিয়ে যায়। গ্রন্থটির সেরা কবিতা দুটি সম্ভবত আগচ্ছমানকে ও দুঃখ পেও না।

পুরানো সাঁঝের তারা (রূপালী বিশ্বাসের প্রথম উপন্যাস) (প্রকাশক–তারুণ্য প্রকাশনা, কলকাতা–৭০০ ০৪১। মূল্য ৪০ টাকা) – লেখিকার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। অবশ্য ঠিক উপন্যাস না বলে নভেলেট বিশেষণ হয়তো বেশি প্রযোজ্য। সোজা কথায় বলা গল্পটিতে পুরানো ব্যর্থ প্রেমের ছায়া মাঝে মধ্যে ঢুকে পড়ে। অনেক লড়াইয়ের পরে ছেলে যখন কর্মজগতে প্রবেশ করল তখন তো নায়িকার দুঃখের দিনের সমাপ্তি হওয়ার কথা। অথচ নায়িকা–কে তারপরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হল কেন। শেষ পর্বের এই বহু ব্যবহৃত মেলোড্রামাকে এড়িয়ে, নারীশক্তির জয়ের কথাকে তুলে ধরার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, কিন্তু লেখিকা সে পথ মাড়ান নি। ছাপা ও প্রচ্ছদ যথাযথ।

জীবন দর্শন

আমরা কেন কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করব?

কেহ শিব ঠাকুরের পুজো করে, কেহ মা কালীর পুজো করে, এভাবে নানান রুচি সম্পন্ন মানুষ নানান দেবদেবীর উপাসনা করে। কিন্তু ওই সকল দেবদেবীর পুজোর মাধ্যমে কেবলমাত্র জড় বা জাগতিক কামনা বাসনা সিদ্ধ হয় ও তার দ্বারা সাময়িক অস্থায়ী সুখ লাভ হয়। কারণ ওই সকল দেবদেবীদের কাছে স্থায়ী সুখ দেওয়ার ক্ষমতা নাই। এইভাবে আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পুজোর বিধান দেওয়া আছে তা হলে কেন আপনি কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করবেন–সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।

আমরা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করব কারণ–

১। **জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পেতে।** যতদিন জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তন করবেন ততদিন আপনার দুঃখ কষ্ট থাকবে। আপনি বিরাট শিব ভক্ত–আপনি শিবলোকে চলে গেলেন–কিন্তু আপনার পূন্য শেষ হলেই আবার পৃথিবীলোকে মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে ও আবার দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। তাই তো গীতায় ভগবান বলছেন–

আব্রহ্মভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মাম্মুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।

এই পৃথিবীলোক থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত ভুবন বা লোক আছে সমস্ত লোকেই পুনর্জন্ম হয়। শুধুমাত্র আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হলে পুনর্জন্ম হয় না ফলে চির সুখ ও চির শান্তির জায়গায় আপনি বসবাস করতে পারবেন। জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাই কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন শ্রেষ্ঠ পন্থা–কারণ তাকে পেলে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

আপনি যতদিন না চিন্ময় জগতে বৈকুণ্ঠলোকে, শ্রীকৃষ্ণের ধামে প্রবেশ করবেন ততদিন আপনাকে জন্ম মৃত্যুর চক্রে দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে। ভগবৎ গীতায় এই ভূবনকে বলা হয়েছে–'মৃত্যু সংসার সাগর'।

২। **ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?** পিতা যেমন চান না তার পুত্র কন্যারা দুঃখ পাক। তেমনি আমাদের পরম পিতা (কারণ আমরা অমৃতস্য পুত্র) চান না তার সন্তান দুঃখে থাকুক, কষ্টে থাকুক। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা আমাদের আহ্বান করছেন, কাছে ডাকছেন হে আমার পুত্রগণ তোমরা আমার কথা শোনো, ও আমার কাছে চলে এসো আমি তোমাদের প্রকৃত সুখের মধ্যে রাখব। এভাবে ভগবান তার সন্তানদের আকর্ষণ করছেন। তাই আমাদের কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে হবে। প্রকৃত সুখ শান্তি ও আনন্দ পেতে। পিতার কাছে পুত্র সবচেয়ে সুখী থাকে।

৩। **জীবের প্রকৃত স্বরূপ জানতে**–জীবের স্বরূপ হয় সে নিত্য কৃষ্ণের দাস, দাস বৃত্তি আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম। আমরা কোনও না কোনও ভাবে কারও না কারও দাসত্ব করছি। কিন্তু স্বরূপত আমরা আমাদের পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের দাস। তার দাসত্ব করলে আমাদের আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না। তাই আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করা উচিত। একমাত্র তারই দাসত্ব করা উচিত।

৪। **কৃষ্ণ ভক্তি অতি প্রাচীন**–স্মরণাতীত কাল থেকে এমনকি আমাদের কল্পনার জগতের বাইরেও যোগী, মুণি, ঋষি, দেবতাগণ, দেবীগণ অসুররা ও (বলি, প্রহ্লাদ ইত্যাদি) ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাদের জীবনের চরম প্রাপ্তি হিসাবে স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। দৈত্যরাজ বলির কাহিনী অনেকের জানা আছে। স্বর্গ মর্ত্য পাতালের অধিপতি ছিলেন দৈত্যরাজ বলি। সেই পরাক্রমী দৈত্য তার গুরু শুক্রাচার্যের আদেশ অমান্য করে–বামনরুপী ভগবানকে ত্রিপাদ ভূমি দানকালে–ভগবানের একটি চরণ তার বক্ষে স্থাপন করে ধন্য হয়েছিলেন।

৫। **শ্রীকৃষ্ণ সবার ঈশ্বর ও আদি**

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম।

দৈত্যরাজ রাবণ পরম শিবভক্ত। তিনি প্রতিদিন নিষ্ঠাসহকারে শিবের আরাধনা পুজো করতেন। সীতা হরণের পর যখন ভগবান রামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণ করেন তখন দৈত্যরাজ রাবণ শিবের কাছে বিজয় প্রার্থনা করেছিলেন। তখন স্বয়ং শিব রাবণকে বলেছিলেন–রামচন্দ্র আমার প্রভূ। তুমি আমার প্রভূর কাছে অন্যায় করেছ। আমি তোমাকে বিজয় আশীর্বাদ দিতে পারব না বা রক্ষা করতে পারব না। স্বয়ং দেবাদিদেব শিবেরও আরাধ্য দেবতা রাম। যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার। ব্রহ্মাজী, শিবজী ও অন্যান্য সকল দেবতাগণ সবাই শ্রীকৃষ্ণের পূজন ও ভজন করে নিজেদের দিব্য আনন্দে রেখেছেন। গোবিন্দং আদি পুরুষং ত্বমহং ভজামি। আমরাও যদি তাদের পথ অনুসরণ করি সুখে থাকব–তাই কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন একমাত্র পন্থা।

৬। **কৃষ্ণ ভক্তি সর্বদা শুভ ফল দান করে।** গীতায় **ভগবান বলছেন**–

নেহাভিক্রমণাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।

সামান্যতম কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন কখনও ব্যর্থ হয় না। এবং এর কোনও ক্ষয় হয় না। সামান্যতম কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনের ফলে সংসারে মহাভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এটা ভগবানের কথা–নিত্য শাশ্বত সত্য। তাই কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করুন।

৭। **দূরাত্মা মহাত্মায় পরিণত হয়।** এই সংসারে কতই ঘটনা আছে যেখানে অতি দূর্জন ব্যক্তিও কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনের ফলে নিজেদের স্বভাব পরিবর্তন করেছে ও মহাত্মায় পরিণত হয়েছে। নবদ্বীপের যোগাই, মাধাই, কাজী এরকম অনেক উদাহরণ আছে। যে কথা গীতায় বলা হয়েছে।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক ব্যবসিতো হি সঃ।

দূরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে তাকে সাধু–মহাত্মা বলে মনে করা উচিত। ও সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্মাত্মায় পরিণত হবে। তাই কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করুন।

৮। **কৃষ্ণভক্তি অতি সহজ ও দ্রুত ফলদানকারী**– স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের সূচনাতে করুণার অবতার চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের বাটিতে শচীমাতার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম সংকীর্তন যজ্ঞের সূচনা করেন। ও বৃহৎ নারদীয় উপনিষদের সে কথা তাকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন।

কলৌ তদহরি কির্তনাৎ।

কলৌ নাস্তেব, নাস্তেব, নাস্তেব গতিরণ্যথা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম –ভগবদুপলব্ধির সহজতম, সরলতম পথ। যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময় শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন করুন। আর জীবনের চরমতম আনন্দ উপভোগ করুন। ভগবানের দিব্য নাম, নৃত্য সহকারে, করতালি দিয়ে, উচ্চৈস্বরে কীর্তন করুন। দেখুন কত সহজে আপনার মনের দুঃখ কালিমা দূর হয়ে যাবে ও আপনি পরমানন্দে অনাবিল আনন্দসাগরে ভাসবেন। জীবনের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করুন শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের মাধ্যমে–সততং কীর্তয়ন্তো মাং– সদা আমার কীর্তন করুন।

৯। **সৃষ্টির মূল রহস্য জানতে**–জীবনের মূল রহস্য কি তা প্রতিদিন বিজ্ঞানীরা নানান তত্ত্ব দিচ্ছে–পারমার্থিক জগতের অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা তা কখনও গ্রহণ করছি–ভুলবশত জীব ও জড়ের পার্থক্য যখন স্কুল জীবনে পড়ানো হয় তখন বলা হয় প্রোটোপ্লাজম জীবের প্রাণ –জড়ের মধ্যে প্রোটোপ্লাজম নেই। তাই নিষ্প্রাণ। এটা মূল পার্থক্য। ছাত্র জীবনে সেটা আমরা গ্রহণ করেছি–না জেনে, না বুঝে কারণ বইতে লেখা আছে। শিক্ষকমহাশয় বলছেন–প্রোটোপ্লাজম এই প্রাণের উৎস–আবার ইদানীং কালে জীবের মধ্যে ঈশ্বর কণার সন্ধান পেয়েছেন যা নাকি প্রাণের উৎস। প্রাণের যে প্রকৃত উৎস কি? সে ব্যাপারে বৈদিক শাস্ত্র নির্দিষ্ট ঠিকানা দিয়ে গিয়েছে– সেটা আমরা জানতে চাইছি না কতকগুলি মনগড়া তত্ত্ব আমাদের পড়তে হয়। ভগবান বলছেন–

অহং বীজপ্রদঃ পিতাঃ–জীবের চেতনার বীজ সেটা আমি, আমি সবার বীজ প্রদানকারী পিতা। আবার বলছেন –অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ। আমি আত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে প্রাণ সঞ্চার করি। সৃষ্টির প্রকৃত উৎস জানতে গেলে আপনাকে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে হবে। তিনিই যে জগতের সৃষ্টি–স্থিতি, প্রলয়ের অধিকারী ও জীবের প্রাণস্বরূপ তা জানতে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করা আবশ্যক।

১০। **আদর্শ চরিত্র গঠন**–কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা যখন জানতে পারব এই জগতে সবাই আমরা ঈশ্বরের সন্তান–অমৃতস্য পুত্র–সমস্ত জীবই আমার ভাই–বন্ধু। ভাবলে আমরা প্রকৃতপক্ষে কেউ কাউকে হত্যা করতে পারি না। এই রকম বহু তত্ত্ব ও যুক্তি আছে যেখানে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের দ্বারা আমরা জীবের প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারব ও আমরা এক বিভেদহীন, দ্বন্দ্বহীন সুস্থ সমাজ গড়তে পারব। তাই আসুন আমরা সবাই কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনে রত হই।

ব্রহ্মাজী ভাগবতে একটি শ্লোকে বলেছেন–

তাবদ–রাগদয় স্তেনা স্তাবৎ কারা গৃহং গৃহম।
তাবন্মোহোহঙ্খিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ।

হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষ যতক্ষণ আপনার ভক্ত না হয় ততক্ষণ জড় আসক্তি, বাসনা মোহ পায়ের শৃঙ্খল স্বরূপ হয়। গৃহ কারাগৃহে পরিণত হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন মানুষের একমাত্র চরম কর্ম ও ধর্ম।

শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনে জয় হোক।

(চলবে...)

ভুলব না মাসুদুরকে

প্রয়াত ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু

কমল নস্কর

মাসুদুর রহমান বৈদ্য, সদ্য প্রয়াত এই সাঁতারুকে নিয়ে লিখতে বসলে প্রথমেই মন চলে যাচ্ছে মাসুদুর ভাইয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার দিনগুলির কথায়। ইংলিশ চ্যানেল, জিব্যাল্টার জয়ের পরেও অকপট সাধারণ জীবনযাত্রার জন্য তিনি আজ বাংলার হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছে। বস্তুত এখানেই মাসুদুর যেন অন্য অনেক অ্যাথলিটের থেকে নিজেকে পৃথক করে নিতে পেরেছিলেন। শুধু কি তাই, জীবনের যে প্রতিকূলতাকে জয় করে মাসুদুর ভাই সাত সমুদ্র তেরো নদী অতিক্রম করেছিল তাও উল্লেখ করার মতো। ছেলেবেলায় উত্তর ২৪ পরগনার বল্লভপুরে বেড়ে ওঠা মাসুদুর মাত্র ১০ বছর বয়সে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় নিজের দু-পা চিরতরে হারায়।

এই রকম জায়গা থেকে জীবনে নতুন করে ফিরে আসার ঘটনা হিন্দি সিনেমায় ভুরি-ভুরি ঘটলেও বাস্তবে শতকরা এক শতাংশও মনে হয় সম্ভব হয় না। অথচ মাসুদুর সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন পেশায় মসজিদের এক মৌলবি। যাঁর অকুণ্ঠ সাহায্যের হাত মাসুদুরকে বাড়তি প্রেরণা যোগায়। এই সব কথা ওঁর মুখেই শুনেছি বহুবার। বিশেষ করে ১৯৯৭ সালে যেভাবে ইংলিশ চ্যানেল এই অক্ষম অবস্থায় পার হয়েছিল সে তা রীতি মতো এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। অনেকটা হিমালয় গিরি শৃঙ্গে পা রাখার মতোই মাসুদুরের (দু-পা হারানো সত্ত্বেও) ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন এক কাজ। যা সহজে সম্পূর্ণ করেছিলেন তিনি। উত্তর ২৪ পরগনার আদি বাসিন্দা হলেও পরে কলকাতার পিকনিক গার্ডেন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে মাসুদুর। সেই সময় সবে কলকাতায় পরিচিতি পাচ্ছেন তিনি। এরপর জিব্যালটার অতিক্রম করার পর মাসুদুরকে নিয়ে একেবারে হই হই পড়ে যায়। যদিও এরজন্য একটুও পা থেকে মাটি সরেনি এই প্রয়াত সাঁতারুর। বরং যত দুর্গম সমুদ্র বা সাগর পেরিয়েছেন ততই যেন নমনীয় হয়ে উঠেছেন ব্যক্তিগত জীবনে। এই ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগানোর কথা অনেক বাণিজ্যিক সংস্থা ভাবলেও সর্বপ্রথম মাসুদুরকে সংবাদপত্রের জগতে প্রতিষ্ঠা দেয় আমাদের ভোরের বার্তা পত্রিকা। এই কাগজের জন্মলগ্ন থেকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর ছিলেন তিনি। এই কাগজে কাজ করতে গিয়েই মাসুদুরের সঙ্গে পরিচয় হয়। বিশেষ করে মনে পড়ে যায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ভোরের বার্তার এক অনুষ্ঠানের কথা। সেখানে নামিদামি বহু চিত্রতারকা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিখ্যাতদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এদের থেকে কোনও অংশে পিছিয়ে ছিলেন না মাসুদুর নিজেও। তাও বরকর্তার মতোই অতিথিদের যেভাবে আপ্যায়ন করছিলেন আজও তা মনের গভীরে প্রোথিত রয়েছে।

একইভাবে দক্ষিণ কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে পত্রিকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাসুদুরকে দেখা গিয়েছে একরকম উদ্যোক্তার ভূমিকায়। তিনি নিজে যে সংস্থার বড় পদে আসিয়ান সেখানকার সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে মিলে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করতে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন আজও তা অম্লান হয়ে থাকবে তৎকালীন ভোরের বার্তা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কর্মী এবং অন্যান্যদের মধ্যে। কিছুদিন আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মনে হয়েছিল আগের থেকে যেন অনেক স্থূল হয়ে গিয়েছে। সে কথা বললে হেসে পাশ কাটান মাসুদুর ভাই। অথচ ওঁর মতো একজন লড়াকু অ্যাথেলিট এভাবে মোটা হয়ে যাচ্ছে কেন ভাবতে কেমন অবাক লাগছে। কদিন পরেই এলো সেই চরম বার্তা। শুনলাম হঠাৎ করেই রক্তাল্পতাতে ভুগতে থাকা মাসুদুরের জীবনাবসান ঘটেছে।

এই খবর পাওয়ার পর থেকেই মনের কোণে ভিড় জমিয়েছে স্মৃতির ঘন কালো মেঘ। যখন তখন ঘন বর্ষা যেন নেমে আসবে দু-চোখ বেয়ে। তাও জীবন জীবনের মতোই চলবে। এখানেই থেমে যাবে না। তবে জীবন যোদ্ধা হিসাবে মাসুদুরের ভূমিকা চির অটুট থাকবে বাংলা তথা আমাদের সমাজে। আগামী দিনে কোনও অক্ষম যুবক যুবতী বা কিশোর কিশোরী মাসুদুরের জীবনাদর্শকে সামনে রেখে অক্লেশে লড়তে পারবেন জীবন সংগ্রামের লড়াই।

কে কে আর আবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই শিরোনামে বেশ বোঝা যাচ্ছে এবারের আইপিএলের দাবিদার হিসেবে ফের নাম উঠে আসছে কলকাতা নাইট রাইডার্স তথা কে কে আর-এর। শাহরুখ খানের মালিকানাধীন এই দলটি জন্মলগ্নের পর প্রথম দু-এক বছর ঘরের ছেলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারেনি। যদিও সৌরভের ক্রিকেট জীবনে তখন একেবারেই শেষ পর্যায়। ফলে দেশকে অসাধারণ ক্যাপ্টেনশিপ উপহার দিলেও নাইট রাইডার্সকে সেভাবে কিছু দিতে পারেনি সৌরভ। সৌরভের বিদায়ের পর নাটকীয় ভাবে মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে গৌতম গম্ভীরের। দিল্লির গৌতম বাংলার তথা কলকাতার এই দলটিকে দু-দুবার আইপিএল জয়ের স্বাদ এনে দিয়েছে। ২০১২-র পর ২০১৪, অর্থাৎ গত তিন বছরে দুবার আইপিএল ঘরে তুলেছে কে কে আর। প্রত্যাশিতভাবেই কে কে আর-এর আসল মালিক হিসেবে গৌতম গম্ভীরকে চিহ্নিত করছেন শাহরুখ খান। সেই গৌতমের নেতৃত্বেই এবারেও যা পারফরম্যান্স গড়ে তুলছে নাইটের যোদ্ধারা তাতে করে তৃতীয়বার এই আইপিএল জয়ের সম্মান কলকাতার ঘরে আসতে পারে বলে মনে করছেন অনেক ক্রিকেটপ্রেমী থেকে বোদ্ধা। নাইটদের কাছাকাছি রয়েছে এই আইপিএলের অন্যতম নিয়মিত বিজয়ী হিসেবে চিহ্নিত চেন্নাই সুপার কিংস। মহেন্দ্র সিং ধোনির মাথায় তাও ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বের টুপি রয়েছে। গৌতম তো ভারতীয় দল থেকে বেশ কিছুদিন বাইরে। তাও তারই নেতৃত্বে এবারেও নাইটরা যে লড়াই দিচ্ছে তা অনস্বীকার্য। এতে তাল মেলাচ্ছেন একের পর এক নাইট যোদ্ধা। কোনও দিন ইউসুফ পাঠান, পিযুশ চাওলা বা সুনীল নারিন কিংবা ব্র্যাড হগরা নায়ক হয়ে উঠছেন। ব্যাটে বলে সমান তালে পাল্লা দিচ্ছেন আর এক ক্যারিবিয়ান তারকা আন্দ্রে রাসেল। ফলে আইপিএল -৮-এর বাজার ফের বেগুনী রঙে মাতোয়ারা। যাদের সঙ্গে একমাত্র লড়াই দিতে পারে হলুদ রঙের ধোনি বাহিনী। অনেক এমনটা বলছেন যে এবার আইপিএলের ফাইনালে গৌতম গম্ভীরের কে কে আরকেই সামলাতে হবে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাইকে।

আন্তর্জাতিক যোগদিবসে ভারত সংস্কৃতির বৈচিত্র তুলে ধরা হবে বিশ্বের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথম আন্তর্জাতিক যোগদিবস পালন হবে আগামী ২১ জুন। ইন্ডিয়ান কাউনসিল ফর কালচারাল রিলেশনস (আই সি সি আর) উদ্যোগ নিয়ে বিশ্বের ৩৭টি জায়গায় যোগ চর্চার শিবির আয়োজন করছে। ভারত সরকারের অনুমোদন পাবার পর পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠন। যাদের মধ্যে আছে ইসকন, ভারতীয় বিদ্যাভবন, শ্রীশ্রী রবিশংকরের আর্ট অফ লিভিং, বাবা রামদেবের পতঞ্জলি যোগকেন্দ্র ও রামকৃষ্ণ মিশন। যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের যোগাসন ও ব্যায়ামের অনুশীলন হবে। বলা হয়েছে, এর মাধ্যমে তুলে ধরা হবে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতীয় পরম্পরা অনুসরণ করেই এই আয়োজন।

ঋষিকেশ ও হরিদ্বার শহরে যেসব যোগ প্রশিক্ষণকেন্দ্র রয়েছে সেগুলি আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগাসনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্যোগে সহযোগীর ভূমিকা নেবে।

আই সি সি আর যে ৩৭টি কেন্দ্র বেছে নিয়েছে সেগুলি ছাড়াও ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র রয়েছে এমন আরও ১০০টি দেশে যোগ-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। যেসব বিদেশি যোগচর্চা ধারাবাহিকভাবে করছেন তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হবে নিজেদের অনুশীলনের অভিজ্ঞতা বলার জন্যে। যোগদিবসকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিদেশ থেকে আসবেন বিখ্যাত মানুষরা যাঁদের যোগচর্চার বিশেষ পরিচিতি রয়েছে।

এই উদ্যোগে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন তুলসী গাবার্ড। তিনি হলেন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের একমাত্র হিন্দু ও ডেমোক্রেট সদস্য। আমেরিকায় ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ চর্চায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। যোগকে বোঝার ক্ষেত্রে যে সাফল্য এসেছে তাতে তুলসী গাবার্ড পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগদিবস ঘোষণা করেছে। আই সি সি আর যোগচর্চাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে চায়। সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে। যোগচর্চার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা সম্ভব।

আই সি সি আর-এর সভাপতি লোকেশ চন্দ্র বলেছেন, 'রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্তাব্যক্তিরা আমার সঙ্গে দেখা করেছেন আর আলোচনা করেছেন ওই বিষয় কিছুদিন আগে। বিস্তৃত কর্মসূচি সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। যা চূড়ান্ত রূপ নেবে এমাসের শেষে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক যোগদিবস উপলক্ষে তাঁর পরামর্শ ও বক্তব্য জানাবেন যার বড় ভূমিকা থাকবে বিশ্ব যোগচর্চায়। দক্ষ যোগ বিশারদের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হচ্ছে শুধু যোগ শুধু যোগ শেখানোর জন্যে নয়, তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতিকেন্দ্রর মাধ্যমে যোগচর্চার দার্শনিক দিকগুলোও তুলে ধরবেন জিজ্ঞাসুজনদের কাছে। এছাড়া লিখিত বিবরণ ও ভিডিও মাধ্যমে যোগ অনুশীলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে। যোগ নিয়ে আলোচনাও হবে।

মোদি সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করেছে অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ যোগ স্থাপনের। যোগচর্চার পৃষ্ঠপোষতার মাধ্যমে 'যোগ অনুশীলন'কে আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে বিদেশিদের কাছে। উল্লেখ্য, ২০ জুন কলকাতায় বাগবাজার ফণীভূষণ মঞ্চে বিকালে এক যোগ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

মনের খেয়াল

জাদু কৌতূক

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে

জাদুকর জাদু দেখাচ্ছেন। তিনি খবরের কাগজের ডবলশিট পাতা নিয়ে, খালি দেখিয়ে একটা বড় মাপের ঝালমুড়ির ঠোঙা তৈরি করলেন। তারপর সেই ঠোঙা থেকে বড় বড় সিল্কের রুমাল বার করতে লাগলেন- সবাই অবাক! শুধু সামনের সারিতে বসা এক মহিলা দর্শকের মনে পড়ে গেল বাড়িতে অনেক বাসি জামা-কাপড় কাচা বাকি আছে। তাই তিনি তাঁর পাশে বসা আর এক মহিলাকে বললেন, 'ওই যাঃ-বাড়িতে অনেক বাসি জামা কাপড় কাচতে হবে, তাই ভাই আর ম্যাজিক দেখে লাভ নেই- যদি ওগুলো দিয়ে কেচে ফেলি এই বলে ভদ্রমহিলা হনহন করে বাড়ি চলে গেলেন।

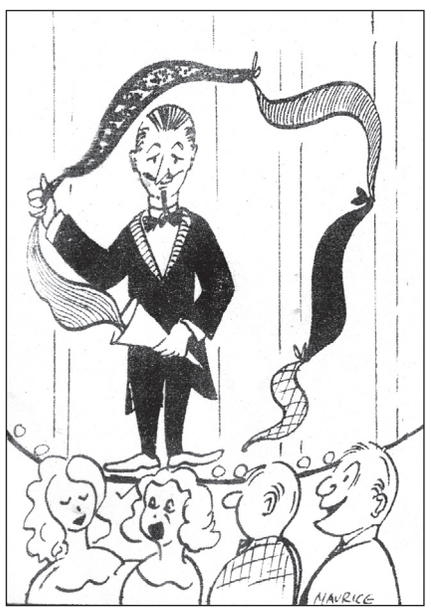

এসএমএস-এর মাধ্যমে তোমরাও মজার মজার গল্প পাঠাও ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

জেনে রেখো জেনে রেখো জেনে

শহিদ মনোরঞ্জন সেন

মৃত্যু : ১৫ মে, ১৯৩০

চট্টগ্রাম কামারপোল যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে বিপ্লবী মনোরঞ্জনের মৃত্যু ঘটে।

শহিদ রজত সেন

মৃত্যু : মে, ১৯৩০

বিপ্লবী শহিদ। চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে গুপ্ত দলে যোগদান করেন। পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে তিনি নিহত হন।

দেশভক্ত ডাঃ সুবোধচন্দ্র সরকার

মৃত্যু : মে, ১৯৫১

ফরিদপুর জেলার বিপ্লবী জননেতা।

ওই অঞ্চলে অনুশীলন দল তিনিই গঠন করেন। চিকিৎসক রূপে দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। নিখরচায় তিনি বহু গরিব লোকের চিকিৎসা করতেন। বৈপ্লবিক কাজের জন্যে বহুবার সরকার কর্তৃক অন্তরীণে আবদ্ধ থাকেন।

বসন্তকুমার রায়

মৃত্যু : ১৮ মে, ১৯৬৬

কৈশোরেই দীক্ষা নেন অগ্নিমন্ত্রে। ১৯২৪ সালে যোগ দেন অনুশীলন সমিতিতে। ১৯৩০ সালে ঢাকায় গ্রেপ্তার হন এবং দীর্ঘ নয় বছর বিভিন্ন ইংরেজ কারাগারে বন্দি থাকার পর ১৯৩৯ সালে মুক্তিলাভ করেন। চাকরি জীবনে তিনি ছিলেন একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বিপ্লবী সুরেন্দ্রমোহন কর রায়

মৃত্যু : ১৭ মে, ১৯৮১

কৈশোরেই বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাসের সান্নিধ্যে এসে বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত হন। পূর্ণচন্দ্র দাস প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিসেনা'-র এক সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরে ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৫-১৯২৭ গ্রেপ্তার হয়ে জেলে আটক ছিলেন। চারমুগরিয়া পোস্ট অফিস আক্রমণের মামলায় গ্রেপ্তার হন এবং স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। আন্দামান এবং বিভিন্ন জেলে কারাবাসের পর স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পূর্বে মুক্তিলাভ করেন।

উপেনচন্দ্র সরকার

মৃত্যু : ১৯ মে, ১৯৮৪

জন্ম ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমায়। ছাত্রাবস্থায় যুগান্তর বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। ১৯১৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ময়মন সিংহের নেত্রকোণায় কংগ্রেস সংগঠন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 'আইন অমান্য' ও 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সামিল হয়ে দফায় দফায় কারাদণ্ড ও বিনা বিচারে বন্দিদশা ভোগ করেন। দেশভাগের পর কলকাতায় চলে এসে যাদবপুর অঞ্চলে কাটজুনগর জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বহন করেন।

রামু নন্দী, সপ্তম শ্রেণি, বিবেক নিকেতন নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি

তোমাদের যদি কোনও মজার গল্প জানা থাকে তবে এখনই তা পাঠিয়ে দাও মনের খেয়ালে। নাম ঠিকানা লিখতে ভুলোনা কিন্তু।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।